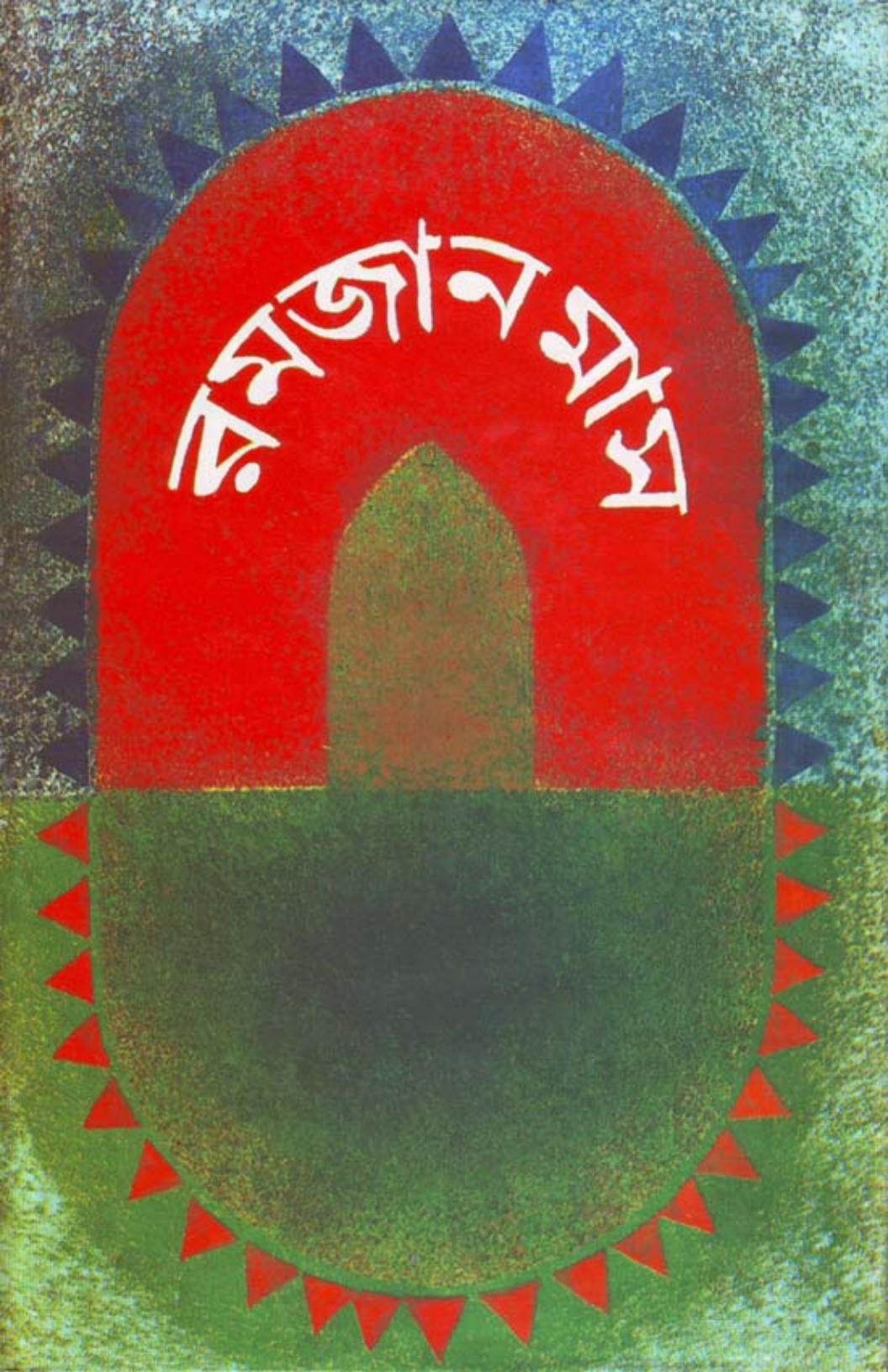
রমজান গ্রন্থ

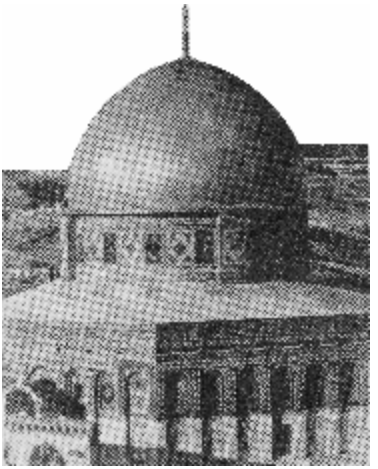

রমজান মাস

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ

রমজান মাস
মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ প্রণীত

প্রকাশক ঃ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ

মুদ্রণ ঃ
শওকত প্রিন্টার্স
১৯০/বি ফকিরেরপুল, ঢাকা–১০০০।
মোবাইল ঃ ০১৭১১-২৬৪৮৮৭
০১৭১৫-৩০২৭৩১

প্রচ্ছদ ঃ
আব্দুর রোউফ সরকার

প্রথম প্রকাশঃ অক্টোবর, ১৯৯৩ ইং
পঞ্চম প্রকাশঃ আগস্ট, ২০০৮ইং

বিনিময় ঃ পঞ্চান্ন টাকা মাত্র।

RAMJAN MASH: A valuable book about Mahey Ramadan written by Mohammad Mamunur Rashid and published by Hakimabad Khanka-e-Mozaddedia.

Exchange Tk. 55/- U.S.$ 5.00

ISBN 984-70240-0046-0

সকল পবিত্রতা ও প্রশংসা বিশ্বসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্তায়ালার জন্যই। সমস্ত রকমের উৎকৃষ্ট দরূদ ও সালাম সৃষ্টিশ্রেষ্ঠ রসূলশ্রেষ্ঠ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি। সকল নবী ও রসূলগণের প্রতি। তাঁর স. এর পরিবার পরিজন ও বংশধরগণের প্রতি। সাহাবা সমাজের প্রতি এবং আউলিয়া কেরামের প্রতি। আমিন।

হাদিস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, পাঁচ স্তম্ভের উপর ইসলামের প্রতিষ্ঠা– ১. কলেমা, ২. নামাজ, ৩. রোজা, ৪. জাকাত এবং ৫. হজ। বক্ষমান গ্রন্থে আমরা পাঁচ স্তম্ভের এক স্তম্ভ রোজার বিষয়ে আলোচনা করেছি। 'রমজান মাস' শিরোনামে রোজা ও 'রোজা'র সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি একত্রিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আল্লাহ্পাক নগণ্যাতিনগণ্য এই ফকিরের খেদমতটুকু কবুল করুন। আমিন।

আন্তরিকতা এবং সতর্কতা সত্ত্বেও ভুলত্রুটি থাকা সম্ভব। তাই অনুরোধ যদি কোনো সহৃদয় আলেম ব্যক্তি কেতাবের ভুলত্রুটি দেখিয়ে দেন তবে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেয়া হবে। যে সমস্ত কেতাবের সূত্রসমন্বয়ে 'রমজান মাস' রচিত হয়েছে সেগুলোর তালিকা বইয়ের শেষে লিখে দেয়া হয়েছে।

সূচনায় এবং সমাপ্তিতে সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

আমাদের বই

- তাফ্সীরে মাযহারী (১–১২) মোট ১২ খণ্ড।
- মাদারেজুন্ নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
- মুকাশিফাতে আয়নিয়া
- মাআরিফে লাদুন্নিয়া
- মাব্দা ওয়া মা'আদ
- মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড
- নকশায়ে নকশ্বন্দ
- বায়ানুল বাকী
- জীলান সূর্যের হাতছানি
- চেরাগে চিশ্তী
- কালিয়ারের কুতুব
- প্রথম পরিবার
- মহাপ্রেমিক মুসা
- নূরে সেরহিন্দ
- তুমিতো মোর্শেদ মহান
- নবীনন্দিনী
- পিতা ইব্রাহীম
- আবার আসবেন তিনি
- সুন্দর ইতিবৃত্ত
- ফোরাতের তীর
- মহাপ্লাবনের কাহিনী
- দুজন বাদশাহ্ যাঁরা নবী ছিলেন
- কী হয়েছিলো অবাধ্যদের
- THE PATH
- পথ পরিচিতি
- নামাজের নিয়ম
- ইসলামী বিশ্বাস
- BASICS IN ISLAM
- মালাবুদ্দা মিনহু
- সোনার শিকল
- বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন
- সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও
- তৃষিত তিথির অতিথি
- ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
- নীড়ে তার নীল ঢেউ
- ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়ঃ

কোরআন শরীফের বিবরণ ৯
হাসিদ শরীফের বিবরণ ১০
মকতুবাত শরীফের বিবরণ ১২
কোরআন মজীদের সঙ্গে সম্পর্ক ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

চাঁদ দেখা ১৫
সেহেরী ১৫
ইফতার ১৬

তৃতীয় অধ্যায়ঃ

রোজার শর্ত ১৮
নিয়ত সম্পর্কে জ্ঞাতব্য ১৮
রোজা ভঙ্গ সম্পর্কিত মাসায়েল ২০
যে সব কারণে রোজা ভাঙে না ২৩
রোজাদারগণের পক্ষে যা মকরূহ্ ২৫
কাফ্ফারা ২৬
অপারগতায় করণীয় ২৬
রোজা রেখেও ভাঙা যায় ২৭

চতুর্থ অধ্যায়ঃ

মোসাফিরের রোজা ২৯
অসুস্থ ব্যক্তির রোজা ৩১
হায়েজ ও নেফাস অবস্থার রোজা ৩২
বার্ধক্যজনিত অবস্থার রোজা ৩৩
ফিদ্য়ার বিধান ৩৩
রমজান সম্পর্কে সতর্কতা ৩৪

পঞ্চম অধ্যায়ঃ

কাজা রোজা ৩৬
তারাবীহ্ নামাজ ৩৭
মান্নতের রোজা ৪০
নফল রোজা ৪২
শবে কদর ৪৩
এতেকাফ ৪৪
ফেতরা ৪৮
শেষ বক্তব্য ৫১

“হে ইমানদারগণ। তোমাদের প্রতি সিয়াম
(রোজা) ফরজ করা হয়েছে যেমন তোমাদের
পূর্ববর্তীদের প্রতিও ফরজ করা হয়েছিলো.....

—সূরা আল বাকারা

প্রথম অধ্যায়

রমজান মাস মহাসম্মানিত মহাপবিত্র মাস। এই মাসে প্রতিদিন রোজা রাখা প্রতিটি মুসলমান পুরুষ ও রমণীদের জন্য ফরজ (অপরিহার্য কর্তব্য)।

আমরা আল্লাহ্তায়ালার বান্দা। আল্লাহ্তায়ালার এই হুকুম আমাদেরকে মানতেই হবে। তাই রমজান মাসের মর্যাদা সম্পর্কে এবং রোজা পালনের নিয়ম কানুন সম্পর্কে আমাদেরকে ভালোভাবে জেনে নিতে হবে। এ বইটিতে আমরা সে সকল আলোচনাই করবো।

কোরআন শরীফের বিবরণ

রমজান মাস সম্পর্কে আল্লাহ্পাক কোরআন মজিদে এরশাদ করেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ o أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ o شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ০

"হে ইমানদারগণ। তোমাদের প্রতি সিয়াম (রোজা) ফরজ করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতিও ফরজ করা হয়েছিলো– যাতে তোমরা পাপ থেকে নিজেদেরকে নিবৃত্ত রাখতে সক্ষম হও। কয়েকটি দিন মাত্র। অতএব, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ হয় (সিয়াম পালনে অক্ষম হয়) কিংবা সফরে থাকে তবে সে অন্য সময়ে গণনা করে সিয়াম আদায় করে নিবে। আর যারা সিয়াম পালনে অপারগ হবে, তারা একজন নিঃস্ব ব্যক্তিকে ফিদ্য়া (খাদ্য) দান করবে। তবে রোজা রাখাই উত্তম যদি তোমরা রোজার মর্যাদা সম্পর্কে সংবাদ রাখো। রমজান মাস– যে মাসে আল কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, মানুষের জন্য হেদায়েত স্বরূপ। তাতে রয়েছে প্রকাশ্য প্রমাণসমূহ যা হেদায়েত ও সমাধান দানকারী। অতএব, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এ মাসের সাক্ষাৎ পায়– সে যেনো সারা মাস রোজা রাখে। আর যদি কেউ অসুস্থ কিংবা মোসাফির হয় তবে সে অন্য সময়ে আদায় করে নিবে। আল্লাহ্পাক তোমাদের ব্যাপারে সহজ পন্থা অবলম্বন করতে চান এবং তোমাদের সঙ্গে কঠোরতা কামনা করেন না। আর যাতে তোমরা রোজার পরিমাণ পূর্ণ করতে পারো। (আর এই রোজা তোমাদের প্রতি এ কারণে ফরজ করা হয়েছে যে) যাতে তোমরা হেদায়েত প্রাপ্তির পর আল্লাহ্তায়ালার মহত্ব বর্ণনা করতে পারো। কেননা হেদায়েত তো তিনিই অনুগ্রহ করে দিয়েছেন সুতরাং তোমরা যেনো আল্লাহ্তায়ালারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

-সূরা আল বাকারা, ১৮৩-১৮৫।

হাদিস শরীফের বিবরণ

হাদিস শরীফে রোজা, রোজাদার এবং রমজান মাস সম্পর্কে বহুবিচিত্র ফজিলতের কথা উল্লেখ আছে। হাদিসসমূহ নীচে উল্লেখ করা হলো ঃ-

এক আদম সন্তানের প্রতিটি নেক আমলই দশগুণ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়। কিন্তু রোজার ব্যাপারটি ভিন্ন। আল্লাহ্পাক বলেন– রোজা শুধু আমার জন্য। সুতরাং আমি নিজে তার বিনিময় দান করবো। আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সে পানাহার ছেড়েছে। প্রবৃত্তির আকাঙ্খা পরিত্যাগ করেছে। রোজাদারদের জন্য দুটি আনন্দের সময় আছে। একটি ইফতারের সময় আর অপরটি প্রভুপ্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়। রোজাদারদের মুখের গন্ধ আল্লাহ্তায়ালার কাছে মিশকের চেয়েও বেশী পছন্দনীয়। –বোখারী, মুসলিম।

দুই বেহেশতের একটি দরোজার নাম রায়য়ান। 'রায়য়ান' শব্দের অর্থ তৃষ্ণা নিবারক ও তৃপ্তিদায়ক। ঐ দরোজা শুধু রোজাদারদের জন্যই। অন্য কেউ ঐ দরোজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। আর ঐ দরোজা দিয়ে যে প্রবেশ করবে সে কোনদিনও পিপাসিত হবে না। –বোখারী, মুসলিম।

তিন রমজান শরীফের উদ্দেশ্যে বৎসরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বেহেশতকে সাজানো হয়। বেহেশতের হুরীগণ সারা বছর রমজান মাসের জন্য সাজসজ্জা করতে থাকে। রমজান মাস এলে বেহেশত বলে– হে আল্লাহ্পাক! আপনি আপনার সৎ বান্দাদেরকে আমার অভ্যন্তরে প্রবেশের অধিকার দান করুন। আয়তআঁখিনী হুরীগণও বলে– হে আল্লাহ্পাক! এই পবিত্র মাসে আপনার সৎ বান্দাদের মধ্য থেকে আমাদের স্বামী নির্ধারণ করে দিন। যে ব্যক্তি এই পবিত্র মাসে কোনো মুসলমানকে দোষারোপ করবে না এবং মদ্যপান করবে না আল্লাহ্তায়ালা তার সমস্ত ছোটো খাটো (সগিরা) গোনাহ মাফ করে দিবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এই পবিত্র মাসে কোনো মুসলমানকে দোষারোপ করবে (গীবত, অপবাদ, গালি গালাজ) অথবা নেশাপান করবে– তার সারা বছরের ইবাদত বন্দেগী মুছে ফেলা হবে।

চার পবিত্র রমজানের প্রথম রাতে আকাশের সকল তোরণ উন্মুক্ত করে দেয়া হয় এবং রমজান শরীফের শেষ রাত পর্যন্ত তোরণসমূহ উন্মুক্তই থাকে। রমজান শরীফের রাতে কোনো মুমিন ব্যক্তি খাঁটি নিয়তে নামাজ পড়লে তার প্রতি রাকাত নামাজের বিনিময়ে তাকে আড়াই হাজার গুণ সওয়াব দেয়া হবে এবং তার জন্য বেহেশতে নির্মাণ করা হবে লাল মনিমুক্তার সুদৃশ্য অট্টালিকা। ঐ অট্টালিকার ষাটটি দরোজা থাকবে এবং প্রত্যেক দরোজার সামনে থাকবে লাল মুক্তাবিশিষ্ট একটি করে স্বর্ণনির্মিত কামরা। যে ব্যক্তি রমজান শরীফের প্রথম তারিখে খাঁটি নিয়তে রোজা রাখে তার বিগত রমজান থেকে এই রমজান পর্যন্ত সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়। আল্লাহ্তায়ালার নিকট তার ক্ষমা প্রার্থনার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিয়োজিত হয়। তারা ফজরের নামাজের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তার জন্য দোয়া করতে থাকে।

পাঁচ রসূলেপাক স. এরশাদ করেন– রোজাদারের নিদ্রা ইবাদত তুল্য। তার মৌনতা তসবী পাঠতুল্য। রোজাদার সামান্য ইবাদতে অধিক বিনিময় লাভকারী। তার দোয়া কবুল হয় এবং গোনাহ্ মাফ হয়। –বায়হাকী।

ছয় হজরত রসূলুল্লাহ স. আরও এরশাদ করেছেন, দোজখের আগুন থেকে বাঁচার ব্যাপারে রোজা ঢাল এবং সুদৃঢ় প্রস্তর-প্রাচীর স্বরূপ। –বায়হাকী।

সাত রোজা রোজাদারদের সুদৃঢ় ঢাল, যে পর্যন্ত রোজাকে মিথ্যাচার ও গীবতের দ্বারা অকেজো করে ফেলা না হয়। –তাবরানী।

আট রোজা দোজখের ঢাল। অতএব মূর্খদের মতো অশ্লীল কথা ও কর্ম রোজাদারদের জন্য অসমীচীন। তার সাথে কেউ অশালীন ব্যবহার করলেও তার সংযত থাকা উচিত। বরং বলা উচিত, আমিতো আল্লাহ্তায়ালার উদ্দেশ্যে রোজা রেখেছি। – নাসায়ী।

নয় রোজাদার ব্যক্তিকে প্রতিদিন ইফতারের সময় একটি প্রার্থনার অনুমতি দেয়া হয়েছে– যা কবুল করা হবে। –হাকেম।

দশ যে ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে– সে ব্যক্তিও ঐ রোজাদারের সমান ছওয়াব লাভ করবে– অথচ ঐ রোজাদারের ছওয়াবও কমবে না। ইফতার যতই সামান্য জিনিসের দ্বারা করানো হোক না কেনো। –আহমদ।

এগার হজরত রসূলে মকবুল স. এরশাদ করেছেন– কেয়ামতের দিন তিন ধরনের ব্যক্তিদের খাওয়া দাওয়ার হিসাব দিতে হবে না। অবশ্য হালাল খাদ্য হওয়া প্রয়োজন। ১। ইফতারের জন্য ব্যবহৃত খাদ্য, ২। সেহেরী হিসাবে ভক্ষিত খাদ্য এবং ৩। ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা প্রহরীর খাদ্য।

বার রমজান মাস এলে দোজখের দরোজা বন্ধ করে দেয়া হয়। বেহেশতের দরোজা খুলে দেয়া হয় এবং শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়।

তের একটি দিনের বিশুদ্ধ রোজা পালনকারীর কাছ থেকে দোজখের ব্যবধান রচিত হয় সত্তর বছরের। –বোখারী, মুসলিম।

মকতুবাত শরীফের বিবরণঃ

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি শায়েখ আহমদ ফারূকী সেরহিন্দী র. রমজান শরীফের ফজিলত সম্পর্কে অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন। তিনি এরশাদ করেছেন–

"জানা প্রয়োজন যে, পবিত্র রমজান মাস মহাসম্মানিত। এই মাসের যে কোনো নফল ইবাদত, যেমন– নামাজ, জিকির, সদকা, অন্য মাসের ফরজের সমতুল্য। কেউ যদি এই মাসে কোনো রোজাদার ব্যক্তিকে খাদ্য পরিবেশন করে ও ইফতার করায় আল্লাহ্পাক তাকে ক্ষমা করবেন এবং দোজখ থেকে নিষ্কৃতি দান করবেন এবং উক্ত

রোজাদারের সমান ছওয়াবও তাঁকে দান করবেন– কিন্তু তাতে ঐ রোজাদারের ছওয়াবও কমবে না। এই মাসে যদি কেউ ভৃত্যদের কাজ লাঘব করে, তবে তাকেও আল্লাহ্পাক ক্ষমা করবেন এবং দোজখানল থেকে মুক্তি দান করবেন।

হজরত নবীপাক স. এ মাসে বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিতেন এবং প্রার্থীদের সকল যাচ্ঞা পূর্ণ করতেন। এ মাসে যদি কেউ নেক আমল করবার সুযোগ লাভ করে তবে সে সারা বছরই নেক কাজ করার সুযোগ পাবে। এ মাস কারো অশান্তিতে অতিবাহিত হলে সারা বছরই তার অশান্তিতে কাটবে। অতএব, যথাসাধ্য প্রফুল্লচিত্তে শান্তির সঙ্গে এই মাস অতিবাহিত করার চেষ্টায় থাকা উচিত এবং এ মাসকে আল্লাহ্তায়ালার নেয়ামত বলে সর্বান্তকরণে যথাসাধ্য মেনে নেয়া উচিত। এ মহান মাসের প্রতি রাতে যে কত সহস্র দোজখীদেরকে দোজখাগ্নি থেকে রেহাই দেয়া হয়– তা বলাই বাহুল্য। এ মাসে বেহেশতের দরোজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং দোজখের দরোজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয় শয়তানকে। আর উন্মুক্ত করে দেয়া হয় রহমতের সকল তোরণ।

সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করা এবং সেহেরীর সময়সীমার শেষ লগ্নে সেহেরী সম্পন্ন করা হজরত রসূলেপাক স. এর আদর্শ। তিনি স. এ ব্যাপারে বিশেষ তাগিদ করেছেন। মনে হয় বিলম্বে সেহেরী এবং অবিলম্বে ইফতার করার মধ্যে বান্দার অক্ষমতা ও মুখাপেক্ষিতার নিদর্শন ফুটে ওঠে– যা বন্দেগীর মাকামের জন্য শোভনীয়।

খোরমা দিয়ে ইফতার করা সুন্নত। ইফতারের পরে এই দোয়া পাঠ করতে হয়– "জাহাবাজ জামায়ো অবতাল্লাতিল উরুকো ওয়া ছাবাতাল আজরো ইনশা আল্লাহ্তায়ালা। অর্থাৎ, আল্লাহ্ চাহেন তো পিপাসা মিটে গেলো, শিরাসমূহ পরিতৃপ্ত হলো এবং ছওয়াবও পাওয়া গেলো।"

এ মাসে তারাবীহ্ নামাজ পাঠ এবং কোরআন মজিদ খতম করা সুন্নতে মোয়াক্কাদা। এতে সীমাহীন উপকার লাভ হয়। আল্লাহ্পাক তাঁর হাবীবপাক স. এর অসিলায় আমাদেরকে উক্ত কাজসমূহ সম্পন্ন করার সুযোগ দান করুন। আমিন।" – মকতুব নং ৪৫, ১ম খণ্ড।

কোরআন মজিদের সঙ্গে সম্পর্ক

কোরআন মজিদ আমাদের জীবন বিধান। কোরআনের অনুকূল জীবন যাপনের মধ্যেই রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল সৌভাগ্য। আর কোরআন মজিদ অবতীর্ণ হয়েছে এই সম্মানিত রমজান মাসেই। সুতরাং এই মাসের মহান মর্যাদা লাভের কারণও এই যে, আল্লাহ্তায়ালার শেষ প্রত্যাদিষ্ট বাণী এ মাসেই এ

পৃথিবীতে এসেছে। অন্যদিকে একথাও বলা যায় যে, মহাপবিত্র গ্রন্থ কোরআন নাজিলের জন্য রমজান শরীফের মতো মহাবরকতের মাসই ছিলো উপযুক্ত সময়।

আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেন ঃ

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ○ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ○ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ○

অর্থঃ নিশ্চয়ই আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রজনীতে; আর মহিমান্বিত রজনী সম্বন্ধে তুমি কি জানো? মহিমান্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

হজরত রসূলুল্লাহ স. এরশাদ করেছেন, বনি ইসরাইলদের মধ্যে এক ব্যক্তি এক হাজার মাস আল্লাহ্র পথে জেহাদে লিপ্ত ছিলো। একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম রা. অবাক হয়ে গেলেন এবং আফসোস করতে লাগলেন– আমরাতো এরকম নেয়ামত কিছুতেই লাভ করতে পারবো না। তখন উপরোক্ত আয়াত নাজিল হয়।

অন্য এক বর্ণনায় আছে– বনি ইসরাইলের এক ব্যক্তি সারা রাত ইবাদত করতেন। আর সারা দিন ধর্মের দুশমনদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন। এভাবে তিনি এক হাজার মাস সময় অতিবাহিত করেছিলেন। এই কাহিনী শুনে সাহাবায়ে কেরাম রা. আফসোস করেন। তখন সূরা কদরের আয়াতগুলি নাজিল হয়।

রমজান মাসের ফজিলতের মধ্যে কদরের রাত্রিও শ্রেষ্ঠ ফজিলত। হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ রাত্রিটি পবিত্র রমজান মাসের ভাগ্যেই পড়েছে। ঐ রাত্রির এই বিপুল মর্যাদালাভের কারণও এই যে– কুরআনুল করীম ঐ রাতেই হকিকতে কোরআন মাকাম থেকে লওহে মাহফুজে স্থানান্তরিত হয়। তারপর কালক্রমে প্রথম আসমানে এবং পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতে থাকে।

শুধু কোরআনুল করিম নয়। পূর্ববর্তী সকল আসমানী গ্রন্থসমূহও এই রমজান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে। নীচে সেগুলোর বিবরণ দেয়া হলো।

হজরত ইব্রাহিম আ. এর সহিফা সমূহ– ৩রা রমজান
তাওরাত শরীফ– ৬ই রমজান
ইনজিল শরীফ– ১৩ই রমজান
যবুর শরীফ– ১৮ই রমজান
কোরআন মজিদ– ২০শে রমজান।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চাঁদ দেখা

মাহে রমজান চন্দ্রমাস হিসাবে গণনা করতে হয়। চন্দ্রমাস কোনোটি ২৯ দিনে আবার কোনোটি ৩০ দিনে হয়। আর রমজান মাস আসে শাবান মাসের পর। তাই শাবান মাসের হিসাবও রাখতে হয় এবং শাবান মাসের ২৯ তারিখে সন্ধ্যায় রমজানের চাঁদ তালাশ করতে হয়। ঐদিন চাঁদ দেখা না গেলে শাবান মাস ৩০ দিন পূর্ণ করতে হবে এবং পরদিন থেকে রোজা শুরু করতে হবে।

রমজান মাসের পর আসে শাওয়াল মাস। শাওয়ালের চাঁদ দেখা গেলেই রোজা শেষ। তাই ২৯ শে রমজান সন্ধ্যায় শাওয়ালের চাঁদ তালাশ করতে হয়। ঐ দিন চাঁদ দেখা না গেলে রমজান ৩০ দিন পূর্ণ করতে হয়।

জ্যোতিষীর গণনার উপর চাঁদ দেখা না দেখা নির্ভর করা উচিত নয়। চাঁদ দেখার সময় ইশারা করা মকরূহ। চাঁদ বড় বা ছোট এরকম আলোচনা নিষেধ।

বর্তমান সময়ে প্রতি দেশে চাঁদ দেখা কমিটি আছে। কমিটিতে দ্বীনদার আলেম ব্যক্তিও আছেন। সুতরাং চাঁদ দেখা কমিটির ঘোষণা মোতাবেক আমল করাতে কোনো দোষ নেই।

সেহেরী

সেহেরী খাওয়া মোস্তাহাব । এতে অনেক সওয়াব রয়েছে। সেহেরীর প্রকাশ্য উপকার এই যে, এর দ্বারা রোজা রাখার কষ্ট কম হয়। সেহেরী রোজা রাখতে উৎসাহিত করে। উপর্যুপরি রোজায় ক্লান্তি আসে না। মনে দুর্বলতা আসে না। এ সমস্ত হচ্ছে রোজার প্রকাশ্য উপকার। আর অভ্যন্তরীণ প্রকৃত উপকার এই যে– সেহেরীর সময় আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ রহমত বর্ষিত হয়। এ সময় দোয়া কবুল হয়। এই সময়ের দোয়া জিকির, এসতেগফার আল্লাহ্তায়ালার নিকট অধিক পছন্দনীয়।

সবচেয়ে বড় কথা সেহেরী খাওয়ার মাধ্যমে হজরত রসূলে মকবুল স. এর ইত্তেবা (অনুসরণ) লাভ হয়। আর সকল ইবাদতের মর্মবাণীই তো রসূলে মকবুল রহমাতুল্লিল আলামীন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সল্লাল্লহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অনুকরণের সৌভাগ্যলাভ।

হাদিস শরীফে সেহেরী সম্পর্কে অনেক ফজিলত বর্ণিত আছে। যেমন–

এক হজরত রসূলুল্লাহ স. এরশাদ করেছেন– নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক ও তাঁর ফেরেশতাগণ সেহেরী গ্রহণকারীদের জন্য রহমত ও করুণা বর্ষণ করেন। –তিবরানী ।

দুই রসূলেপাক স. এরশাদ করেন– ইহুদী খৃস্টানদের রোজা এবং আমাদের রোজার মধ্যে ব্যবধান হচ্ছে সেহেরী। (তারা সেহেরী গ্রহণ করে না। আমরা করি)। – মুসলিম।

তিন হজরত নবী পাক স. এরশাদ করেন তোমরা সেহেরী খাও। এতে অনেক বরকত ও উপকার আছে।

চার হজরত ইররাজ বিন সারীয়া রা. বলেনঃ একদা রমজানে হজরত রসূলেপাক স. আমাকে সেহেরী খেতে ডাকলেন এবং বললেন, এসো এই পবিত্র আহারের দিকে। – আবু দাউদ ও নাসায়ী।

পাঁচ হজরত আবু হুরাইরা রা. বলেন– হজরত রসূলুল্লাহ স. এরশাদ করেছেন– মুমিনদের জন্য খেজুর কতোইনা উত্তম সেহেরী। –আবু দাউদ।

উদর পূর্ণ করে খাওয়া হজরত রসূলে করিম স. এর সুন্নত নয়। আর যা সুন্নত নয় তা উপকারীও নয়। সেহেরী খাওয়ার সময়ও তাই সুন্নত রীতি অনুযায়ী খাওয়া উচিত। এক ভাগ আহার, একভাগ পানি আর এক ভাগ খালি।

বিলম্বে সেহেরী খাওয়া মোস্তাহাব। তার মানে এত দেরী নয় যাতে সেহেরীর সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যায়। সাবধান! সোবহে সাদেক শুরুর আগেই সেহেরী শেষ করতে হবে।

ইফতার

ইফতারের সময় হয়ে গেলেই ইফতার করে নেয়া উচিত। দেরী করা উচিত নয়। অবিলম্বে ইফতার শরীয়তে পছন্দনীয়। তার অর্থ আবার এও নয় যে, ইফতারের সময় হওয়ার আগেই ইফতার করতে হবে। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই ইফতার করা উত্তম।

ইফতার সম্পর্কিত হাদিসসমূহ নীচে উল্লেখ করা হলো–

এক হজরত সাহল বিন সাদ রা. বলেন, রসূলেপাক স. এরশাদ করেছেন– মানুষ কল্যাণের মধ্যে থাকবে যতক্ষণ তারা বিনা বিলম্বে ইফতার করবে। – বোখারী, মুসলিম ।

দুই হজরত ওমর রা. বলেন, হজরত নবী পাক স. এরশাদ করেছেন– যখন এই (পূর্ব) দিক থেকে রাত আসতে থাকবে আর এই (পশ্চিম) দিক থেকে দিন চলে যেতে শুরু করবে এবং সূর্য ডুবে যাবে তখনই রোজাদার ইফতার করবে। –বোখারী, মুসলিম।

তিন হজরত আবু হুরায়রা রা. এর বর্ণনা, রসূলে মকবুল স. এরশাদ করেছেন– আল্লাহ্তায়ালা জানিয়েছেন– আমার বান্দাদের মধ্যে আমার নিকট অধিকতর প্রিয় তারাই যারা অবিলম্বে ইফতার করে। –তিরমিজী।

চার হজরত সালমান বিন আমের রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স. এরশাদ করেন– যখন তোমাদের কেউ ইফতার করতে চায় সে যেনো খেজুর দিয়ে ইফতার করে। কেনোনা এতে বরকত রয়েছে। যদি খেজুর না পায় তবে যেনো পানি দ্বারা ইফতার করে। – তিরমিজী ।

পাঁচ হজরত জায়েদ বিন খালেদ রা. এর বর্ণনা, হজরত নবী পাক স. এরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি রোজাদারকে ইফতার করিয়েছে অথবা কোনো গাজীকে জেহাদের সামগ্রী দান করেছে– তাদের সওয়াব একইরকম। –বায়হাকী।

ছয় হজরত ইবনে ওমর রা. এর বর্ণনা, নবী করিম স. যখন ইফতার করতেন তখন বলতেন– পিপাসা দূর হলো। শিরা উপশিরাসমূহ শান্ত হলো এবং আল্লাহ্ চাহেন তো সওয়াব নির্ধারিত হলো। –আবু দাউদ।

সাত তাবেয়ী হজরত মুআজ বিন জোহরা বলেন, নবী পাক স. যখন ইফতার করতেন তখন বলতেন –

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

(আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু ওয়া আ'লা রিজকিকা আফত্বরতু)

আয় আল্লাহ্ আমি তোমার জন্যই রোজা রেখেছিলাম আবার তোমার দেয়া রিজিকেই রোজা ভঙ্গ করছি। –আবু দাউদ।

আট হজরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, রসূলে মকবুল স. এরশাদ করেছেন– যতদিন পর্যন্ত মানুষেরা শীঘ্র শীঘ্র ইফতার করবে ততদিন দ্বীন বিজয়ী থাকবে। কেনোনা ইহুদী ও খৃস্টনরা দেরীতে ইফতার করে। –আবু দাউদ, ইবনে মাজা।

তৃতীয় অধ্যায়

রোজার শর্ত

রোজার শর্ত তিন প্রকার। প্রথম প্রকার হলো ওয়াজিব (অবশ্য পালনীয়) হওয়ার শর্ত। ঐ ব্যক্তির উপর রোজা অবশ্য পালনীয় হবে যে ব্যক্তি–

১। মুসলমান হবে

২। জ্ঞানবান হবে

৩। প্রাপ্ত বয়স্ক হবে।

দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে আদায় করার শর্ত। ঐ ব্যক্তির রোজা পালন করা জরুরী হবে যে ব্যক্তি–

১। সুস্থ হবে

২। গৃহবাসী (মুকিম) হবে।

তৃতীয় প্রকার শর্ত হচ্ছে– রোজা পালন শুদ্ধ হওয়ার শর্ত। রোজা শুদ্ধ হওয়ার শর্ত দুইটি। রোজা আদায় শুদ্ধ হতে হলে রোজাদারের–

১। নিয়ত শুদ্ধ হতে হবে

২। রোজাদার মহিলা হলে তাকে হায়েজ নেফাস থেকে পবিত্র থাকতে হবে।

নিয়ত সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

নিয়তের অর্থ এই যে– অন্তরে যেনো এ ধারণা থাকে যে, সে রোজা রাখছে।

এ সম্পার্কে জেনে নেয়া প্রয়োজন যে–

১। রোজা যেমন ফরজ তেমনি প্রতি রোজার জন্য নিয়তও ফরজ।

২। সেহেরী খেলেই নিয়ত আদায় হয়ে যায়।

৩। তবে সেহেরী খাওয়ার সময় যদি এরকম নিয়ত করে যে– সকাল হলে আর রোজা রাখব না– তবে নিয়ত হবে না।

৪। যদি রোজাদার রোজা ভঙ্গের নিয়ত করে– কিন্তু ঐ নিয়ত ছাড়া সে রোজা ভঙ্গের কোনো কাজ না করে, তবে তার রোজা হয়ে যাবে।

৫। রোজার নিয়ত রাত্রি থেকে দুপুরের আগে যে কোনো সময় করা যায়।

৬। রমজানের রোজা, মান্নতের রোজা, নফল রোজা– সকল রোজার ক্ষেত্রেই নিয়ত করার সময়সীমা একই।

৭। মুকিম, মোসাফির, সুস্থ, অসুস্থ– সকল রোজাদারদের নিয়ত করার নিয়মও এক।

৮। মনে রাখবে দুপুরের আগ পর্যন্ত নিয়ত করা ঐ সময়ই শুদ্ধ হতে পারে যদি রোজাদার সেহেরীর সময় থেকে রোজা ভঙ্গের কোনো কাজ না করে। যদি করে থাকে তবে তার নিয়ত শুদ্ধ হবে না।

৯। দুপুরের আগে নিয়ত করলে এরকম নিয়ত করবে যে– যে সময় দিন শুরু হয়েছে তখন থেকে আমি রোজাদার।

১০। যদি নিয়ত করে আমি যখন থেকে নিয়ত করছি তখন থেকে রোজাদার, তবে নিয়ত শুদ্ধ হবে না। রোজাদারও হবে না।

১১। যদি সেহেরী শেষে রোজার নিয়ত করার পরও সোবহে সাদেক হতে বিলম্ব থাকে। তবে সোবহে সাদেক পর্যন্ত পানাহার, স্ত্রী সহবাস সবই করা যাবে। কারণ, রোজা শুরু হয় সোবহে সাদেক থেকে। সুতরাং যত আগেই নিয়ত করা হোক না কেনো– নিয়তের কার্যকারিতা তখনই শুরু হয় যখন থেকে রোজা শুরু হয়।

১২। 'আমি আজ রোজা রাখছি' তাতেই রমজান শরীফের রোজার নিয়ত হবে। 'রমজান শরীফের ফরজ রোজা রাখছি' এরকম নির্দিষ্ট কিছু খেয়াল না করলেও চলবে।

১৩। যদি কেউ রমজান মাসের রোজা করার সময় এ রকম নিয়ত করে যে সে নফল রোজা রাখছে অথবা মনে করে এখন নফল রোজা রাখি– রমজানের রোজা পরে কাজা করে নিবো– তবুও তার রমজানের ফরজ রোজাই আদায় হয়ে যাবে। নফল হবে না।

১৪। কোনো ব্যক্তির গত বছরের রোজা বাদ পড়েছে। সে রোজার কাজাও করেনি। ইতোমধ্যে পরবর্তী রমজান এসে পড়েছে। এখন যদি সে রোজা রাখে আর গত বছরের কাজা আদায়ের নিয়ত করে তবুও এ বছরের রোজাই আদায় হবে। কাজা আদায় হবে না।

১৫। কোনো ব্যক্তি মান্নত করেছিলো– অমুক কাজ হয়ে গেলে আমি আল্লাহ্তায়ালার উদ্দেশ্যে একটি বা দুটি রোজা রাখবো। তারপর তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। কিন্তু সে মান্নতের রোজা রাখেনি। ইতোমধ্যে রমজান মাস এসে পড়েছে। এখন যদি সে রোজা করে আর মান্নতের রোজা আদায়ের নিয়ত করে– তবুও তার রমজানের রোজাই আদায় হবে। মান্নতের রোজা আদায় হবে না। অর্থাৎ রমজান মাসে অন্য কোনো প্রকার রোজা করা যাবে না। করলেও তা রমজানের রোজা বলে গণ্য হবে।

১৬। যদি কোনো রমণী রাতে হায়েজ অবস্থায় রোজার নিয়ত করে। পরে যদি সোবহে সাদেকের আগে আগে হায়েজ থেকে পবিত্র হয়ে যায় তবে তার রোজা শুদ্ধ হবে।

১৭। মনে মনে নিয়ত করাই নিয়ত। মনে রাখতে হবে নিয়ত মনেরই ব্যাপার। মুখে উচ্চারণ বাড়তি কাজ। একাজ করা না করা সমান কথা।

রোজা ভঙ্গ সম্পর্কিত মাসায়েল

কী কী কারণে রোজা ফাসেদ হয় সে সমস্ত জেনে রাখা অতি প্রয়োজন। না জানলে নিজের অজান্তেই রোজা নষ্ট হয়ে যাবে। অথচ রোজার কষ্ট করে কোনো লাভও হবে না।

এ ব্যাপারে জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ নিম্নে লিখে দেয়া হলোঃ

১. যদি রোজাদার ব্যক্তি ভুলে কিছু খায় বা পান করে অথবা স্ত্রী সহবাস করে তবে রোজা ভঙ্গ হয় না। এই নিয়ম সকল প্রকার রোজার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

২. এরকম ভুলে যদি পেট ভরেও খায় তবুও রোজা ভাঙবে না। কিন্তু রোজার কথা স্মরণ হলে সঙ্গে সঙ্গে আহার বা সহবাস বন্ধ করে দিতে হবে। জ্ঞাতসারে পানাহার বা সহবাস করলে অবশ্যই রোজা ফাসেদ (নষ্ট) হয়ে যাবে।

৩. কোনো রোজাদারকে ভুলবশতঃ খেতে দেখলে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া ওয়াজিব (অবশ্য কর্তব্য)। কিন্তু যদি দেখে সে ব্যক্তি দুর্বল এবং রোজা রাখতে অসমর্থ তবে স্মরণ করাবে না। তাকে খেতে দিবে।

৪. কুলি করার সময় এবং নাকে পানি দেয়ার সময় যদি পেটে পানি যায় তবে রোজার কথা স্মরণ থাকলে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে এবং পরে কাজা করতে হবে। আর যদি রোজার কথা স্মরণ না থাকে তবে রোজা নষ্ট হবে না।

৫. গোসলের সময় যদি পানি ফুসফুসে চলে যায়। তবে রোজা ফাসেদ হয়ে যাবে।

৬. যদি কোনো রোজাদার খাদ্যবস্তু নয়– এমন কিছু গিলে ফেলে যেমন পাথর বা মাটি তবে রোজা ফাসেদ হয়ে যাবে। ঐ রোজার কাজা করতে হবে কিন্তু কাফ্ফারা প্রয়োজন হবে না।

৭. যদি কোনো কিছু চিবিয়ে তার রস গিলে ফেলে তবে রোজা ফাসেদ হয়ে যাবে এবং এর জন্য কাফ্ফারা ওয়াজিব (অবশ্য পালনীয়) হবে।

৮. যদি তরমুজের ছোলা বা এ জাতীয় কোনোকিছু যা মানুষে খেতে পারে– এ সমস্ত খেলেও রোজা নষ্ট হয়ে যাবে। কাফ্ফারাও আদায় করতে হবে।

৯. যদি চাল, মশুরী, মাশকালাই খেয়ে ফেলে তবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। তবে কাজা ওয়াজিব হবে।

১০. দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা সামান্য খাদ্যকণা গিলে ফেললে রোজা ফাসেদ হবে না বটে তবে পরিমাণে বেশী হলে রোজা ফাসেদ হবে। বুটের দানার সমান বা এর চেয়ে বেশী হলে তাকে বেশী ধরা হয় আর বুটের দানার চেয়ে কমকে সামান্য ধরা হয়।

১১. মুখ থেকে বের করে নিয়ে পুনরায় গিলে ফেললে সামান্য খাদ্যবস্তুর ক্ষেত্রেও রোজা ফাসেদ হবে।

১২. নিজের থুথুও হাতে নিয়ে গিলে ফেললে রোজা ফাসেদ হবে।

১৩. রক্ত পান করলে রোজা ভেঙে যাবে। কাজা ওয়াজিব হবে। কাফ্ফারা হবে না। রক্ত যদি দাঁত থেকে বের হয়ে থুথুর সঙ্গে মিশে হুলকুমে যায় তবে রক্তের পরিমাণ থুথুর চেয়ে বেশী হলে রোজা ভেঙে যাবে। আর থুথুর পরিমাণ রক্তের চেয়ে বেশী হলে রোজা ভাঙবে না।

১৪. যদি বর্ষার পানি অথবা বরফের পানি হুলকুমে প্রবেশ করে তবে রোজা ভেঙে যাবে।

১৫. লোবান বা আগরবাতি জ্বালিয়ে তার ধোঁয়া নাকে টেনে নিলে রোজা ভেঙে যাবে। বিড়ি, সিগারেট বা হুক্কার ধোঁয়া পান করলেও রোজা ভেঙে যাবে।

১৬. কেউ যদি সেহেরী খাওয়ার পর পান চিবাতে চিবাতে ঘুমিয়ে পড়ে এবং পান মুখে থাকা অবস্থায় ভোর হয়ে যায় তবে তার রোজা শুদ্ধ হবে না। এই রোজা সে ভাঙতেও পারবে না। আবার এর পরিবর্তে একটি রোজাও কাজা করতে হবে। কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

১৭. কুল্লি করার সময় যদি রোজার কথা স্মরণে থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ করে হুলকুমের মধ্যে পানি প্রবেশ করে অথবা পুকুরে বা অন্য কোথাও ডুব দিয়ে গোসল করার সময় নাক বা মুখ দিয়ে হুলকুমে পানি চলে যায় তবে রোজা ভেঙে যাবে। এ অবস্থায় পানাহারও করতে পারবে না। এই রোজা কাজা করা ওয়াজিব। কাফ্ফারা ওয়াজিব নয়।

১৮. আপনাআপনি বমি হয়ে গেলে রোজা নষ্ট হয় না। বমি কম হোক অথবা বেশী হোক। কিন্তু ইচ্ছা করে মুখ ভর্তি করে বমি করলে রোজা নষ্ট হয়ে যায়। কম বমি করলে রোজা নষ্ট হয় না।

১৯. আপনাআপনি সামান্য বমি হওয়ার পর আপনাআপনি যদি হুলকুমের ভিতরে চলে যায় তবে রোজা নষ্ট হয় না। কিন্তু যদি ইচ্ছা করে সামান্য বমিও গিলে ফেলে, তবে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে। আবার বেশী বমির ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃতভাবে হুলকুমে চলে গেলেও রোজা নষ্ট হয়ে যাবে। এ অবস্থায় পানাহার করবে না। পরে কাজা আদায় করে নিবে।

২০. যদি কেউ হঠাৎ একটি পাথরের টুকরা অথবা লৌহখণ্ড অথবা পয়সা গিলে ফেলে (খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না এমন যে কোনো বস্তু) তবে রোজা ভেঙে যাবে। এই রোজার কাজা ওয়াজিব হবে। কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

২১. রোজাদার যদি স্ত্রী সহবাস করে অথবা তার পুরুষাঙ্গ স্ত্রীঅঙ্গে প্রবেশ করায় তবে তার রোজা ভেঙে যাবে। এ অবস্থায় কাজা ও কাফ্ফারা দুটিই ওয়াজিব (অবশ্য পালনীয়) হবে।

২২. রমজান মাসের রোজা রেখে ভাঙলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়। রমজান ছাড়া অন্য সময়ের যেকোনো প্রকার রোজা রেখে ভাঙলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় না। শুধু কাজা ওয়াজিব হয়। রমজানের কাজার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। (কাজার অর্থ এক রোজার বদলে একটি রোজা আদায় করা। কাফ্ফারা বলতে একটি রোজার বদলে ৬০টি রোজা আদায় করা বুঝায়। একটু পরেই কাফ্ফারার বিবরণ আসবে)।

২৩. নাকে নস্য টানলে, কানে তেল দিলে অথবা পশ্চাত দ্বারে ঢুস্ লাগালে রোজা ভেঙে যাবে। এমতাবস্থায় এ রোজার কাজা আদায় করতে হবে। কাফ্ফারা করতে হবে না।

২৪. রোজা অবস্থায় প্রস্রাবের রাস্তায় ঔষধ অথবা কোনোপ্রকার তেল রাখা বা মালিশ করা নিষেধ। এরকম করলে রোজা ভেঙে যাবে। কাজা করতে হবে। কাফ্ফারা লাগবে না।

২৫. ধাত্রী যদি প্রসূতির স্ত্রীঅঙ্গে কোনো কারণবশতঃ হাতের কোনো আঙুল প্রবেশ করিয়ে দেয় অথবা নিজের স্ত্রী অংগে আঙুল ঢুকায় তবে রোজা ভাঙবে না। কিন্তু পুনরায় ঢুকালেই রোজা ভেঙে যাবে। আর যদি আঙুল পানি দ্বারা ভেজা থাকে তবে একবার ঢুকালেই রোজা ভেঙে যাবে।

২৬. রোজা রেখে দিনের বেলায় কয়লা, মাজন বা বালুর দ্বারা দাঁত মাজা মকরূহ। যদি এর কিছু অংশ হুলকুমে চলে যায় তবে রোজা ভেঙে যাবে।

২৭. ভুলে পানাহার করলে রোজা যায় না। কিন্তু এরকম হঠাৎ হয়ে গেলে রোজা ভেঙে গিয়েছে মনে করে যদি কেউ কিছু খেয়ে নেয় তবে রোজা ভেঙে যাবে। এ রোজার কাজা করতে হবে। কাফ্ফারা প্রয়োজন হবে না।

২৮. আপনাআপনি বমি হলেও রোজা নষ্ট হয় না। কিন্তু রোজা নষ্ট হয়েছে মনে করে যদি কেউ পরে পানাহার করে তবে তার রোজা নষ্ট হয়ে যাবে। এ রোজার কাজা ওয়াজিব হবে। কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

২৯. কেউ যদি সুরমা বা তেল লাগানোর পর অজ্ঞতাবশতঃ মনে করে যে তার রোজা নষ্ট হয়েছে এবং এর পরে যদি পানাহার করে তবে তার কাজা ও কাফ্ফারা উভয়টিই ওয়াজিব হবে।

৩০. রমজান মাসে কোনো কারণবশতঃ যদি কারো রোজা ভেঙে যায় তবুও দিনের বেলায় তার জন্য খাওয়া দাওয়া করা শোভনীয় নয়। রোজাদারদের মতো পানাহার থেকে দূরে থাকা তার জন্য ওয়াজিব।

৩১. রোজার নিয়ত করে রোজা ভাঙলে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়। রমজানে রোজার নিয়ত না করে কেউ খাওয়া দাওয়া করলে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

৩২. ঘুমন্ত রোজাদার স্ত্রীর সঙ্গে যদি তার রোজাদার স্বামী সহবাস করে ফেলে তবে উভয়েরই রোজা ভেঙে যাবে। স্ত্রীর শুধু কাজা ওয়াজিব হবে। আর স্বামীর কাজা ও কাফ্ফারা– দুইটিই ওয়াজিব হবে।

৩৩. স্ত্রীকে চুম্বন করলে যদি স্বামীর বীর্যস্খলন হয়ে যায় তবে স্বামীর রোজা নষ্ট হয়ে যাবে। এরকম হলে কাজা ওয়াজিব হবে। কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

৩৪. যদি স্ত্রী যৌন উত্তেজনা সহ স্বামীকে চুম্বন করে তবে তার রোজা ভেঙে যাবে। অথবা চুম্বনের সময় বা পরেও যদি যৌন আস্বাদন অনুভব করে, তবে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে।

৩৫. কোনো স্ত্রীলোক কোনো কারণ বশতঃ তার লজ্জাস্থানে ফোঁটা ফোঁটা তেল বা ঔষধ ঢেলে দেয় তবে তার রোজা ভেঙে যাবে।

৩৬. পেটের বা মাথার জখমে ভেজা কোনো ঔষধ লাগালে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে। ঔষধ শুকনা হলে মাথায় বা পেটে যেহেতু ঔষধ প্রবেশ করবে না তাই রোজাও ভাঙবে না।

৩৭. যদি রোজাদার এস্তেনজার সময় এতটুকু সময় দেরী করে যে তার প্রস্রাব বা পায়খানার রাস্তায় পানি প্রবেশ করে তবে তার রোজা ভেঙে যাবে।

যে সব কারণে রোজা ভাঙে না

এমন কিছু কাজ আছে যা হয়ে গেলে রোজা ভেঙেছে বলে সন্দেহ হয়। অথচ রোজা ভাঙে না– সে সমস্ত বিষয়াদিও মোটামুটি জেনে রাখা উচিত যাতে অযথা সন্দেহ থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখা যায়।

এ সম্পর্কে জেনে রাখা প্রয়োজন যে–

১.কারো কারো ঘুমন্ত অবস্থায় মুখ থেকে লালা গড়িয়ে পড়ে। আবার টান দিলে বাইরের গড়িয়ে পড়া লালা মুখে চলে আসে। কোনো ঘুমন্ত রোজাদার ব্যক্তি যদি ঘুমন্ত অবস্থায় বা ঘুম থেকে জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে লালা টান দিয়ে নিয়ে গিলে ফেলে তবে রোজা ভঙ্গ হবে না।

২. মুখের থুথু যত বেশী হোকনা কেনো গিলে ফেললে রোজা ভাঙে না।

৩. ঘুমন্ত রোজাদার ব্যক্তি স্বপ্নে কিছু খেলে তার রোজা ভাঙবে না।

৪. রোজা অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলেও রোজা ভাঙবে না।

৫. আপনাআপনি যদি হুলকুমের মধ্যে মাছি, ধোঁয়া বা ধূলা চলে যায় তবে রোজা ভাঙবে না।

৬. রোজা রেখে সুরমা ব্যবহার করা, তেল লাগানো অথবা আতর সুগন্ধি ইত্যাদির সুঘ্রাণ গ্রহণ করাতে কোনো দোষ নেই। চোখে সুরমা লাগালে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যদি থুথু বা শ্লেষ্মায় সুরমার রঙ দেখা যায় তবুও রোজা ভঙ্গ হবে না। মকরূহও হবে না।

৭. নাকের শ্লেষ্মা জোরে টানার কারণে যদি হুলকুমে চলে যায় তবে রোজা নষ্ট হবে না।

৮. রাতে সহবাস করলে রাতেই গোসল করে নেয়া উচিত। কেউ যদি ফরজ গোসল না করেও রোজা রাখে তবুও তার রোজা ভঙ্গ হবে না।

৯. রোজা রেখে দিনের বেলায় স্বামী স্ত্রী এক সঙ্গে শোয়া, হাত লাগানো, আদর করা সবই বৈধ। কিন্তু কামভাব প্রবল হবার আশংকা থাকলে অবৈধ। যে সমস্ত বৃদ্ধ মনচাঞ্চল্য থেকে মুক্ত তাদের জন্যে দোষণীয় নয়।

১০. শেষ রাতে সেহেরী খাওয়ার পর কেউ কেউ পান খায়। এরকম অভ্যাস থাকলে ভোর (সোবহে সাদেক) হওয়ার আগেই ভালো করে কুলি করে নেয়া উচিত। উত্তমরূপে কুলি করার পরও যদি সকালে থুথু কিছু লাল দেখায় তবুও রোজা নষ্ট হবে না।

১১. রোজা অবস্থায় ইনজেকশন নিলে রোজা নষ্ট হয় না।

১২. কোনো জিনিস জিহ্বার অগ্রভাগ দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করে ফেলে দিলে রোজা ভাঙেনা। কিন্তু একান্ত প্রয়োজন ব্যতিরেকে এরকম করা মকরূহ। অবশ্য যদি কোনো মহিলার স্বামী এরকম নিষ্ঠুর হয় যে তরকারীতে লবণ একটু কমবেশী হলে অত্যাচার করে তবে সেই মহিলার জন্য তরকারীর লবণ জিহ্বার অগ্রভাগ দিয়ে পরীক্ষা করে নিয়ে, থুথু ফেলে দেয়াতে দোষ নেই।

১৩. রোজা অবস্থায় শিশুদের খাবার বা অন্য কিছু চিবিয়ে দেয়া মকরূহ। অবশ্য পরিস্থিতি যদি এরকম হয় যে শিশুর জীবন বিপন্ন হতে পারে আর চিবিয়ে দেয়ার কোনো লোক না থাকে তবে রোজাদার ব্যক্তি চিবিয়ে দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে ফেলা বৈধ হবে।

১৪. কাঁচা বা শুকনা মেসওয়াক দ্বারা দাঁত মাজা দোষণীয় নয়। এমন কি কাঁচা মেসওয়াকের তেতো, কষা বা অন্য যে কোনো স্বাদ যদি মুখে অনুভূত হয় তবুও রোজার কোনো ক্ষতি হবে না। মকরূহও হবে না।

১৫. মাছি বা ঐ জাতীয় কোনো প্রাণী অসতর্কতা বশতঃ গিলে ফেললে রোজা নষ্ট হবে না।

১৬. যদি কারো হুলকুমে ঘাম, ধূলি, ঔষধের স্বাদ অথবা ধোঁয়া প্রবেশ করে তবে রোজা নষ্ট হবে না।

১৭. চোখের পানি দুই এক ফোঁটা যদি মুখে প্রবেশ করে তবে রোজা ভাঙবেনা। পানি যদি অনেক হয় এবং নোনা স্বাদ স্পষ্ট অনুভূত হয় তবে অবশ্য রোজা ভেঙে যাবে।

১৮. চোখে ঔষধ লাগালে যদি ঔষধের স্বাদ গলায় অনুভূত হয় তবে রোজা নষ্ট হবে না।

১৯. শুধু কফ বমি করলে রোজা ভাঙবে না।

রোজাদারগণের পক্ষে যা মকরূহ

কিছু কিছু এমন কাজ আছে যে সমস্ত করলে রোজা ভাঙে না বটে তবে রোজাদারদের জন্য যে সমস্ত কাজ অশোভনীয় এবং অপ্রিয় এসবকে মকরূহ বলা হয়। এসমস্ত বিষয়াদিও জেনে রাখা প্রয়োজন। যেমন–

১. রোজাদারদের পক্ষে ছানা আটা চিবানো মকরূহ।

২. বিনা আবশ্যকে কোনো বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করা বা কোনো বস্তু চিবানো মকরূহ।

৩. রোজাদারদের এস্তেনজার জন্য বেশী পানি ব্যবহার করা মকরূহ।

৪. নাকে পানি দেয়া বা কুলি করার সময় বেশী পানি ব্যবহার করা মকরূহ।

৫. পানির মধ্যে বদবায়ু ছাড়লে মকরূহ হবে।

৬. অজু গোসল ব্যতীত অন্য সময় অনাবশ্যকভাবে কুলি করা বা নাকে পানি দেয়া মকরূহ।

৭. থুথু মুখে জমা করে গিলে ফেলা মকরূহ।

৮. কামভাবের আশংকা থাকলে স্ত্রী স্পর্শ করা মকরূহ হবে।

৯. বিনা কাম ভাবেও ওষ্ঠদ্বয় চোষা মকরূহ হবে।

১০. দুই ঈদে এবং আইয়ামে তাশরীকের দিনসমূহে রোজা রাখা মকরূহ। কেউ রাখলে তার রোজা হয়ে যাবে। আর ভাঙলে এর জন্য কাজা করতে হবে না।

১১. নির্দিষ্ট করে শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখা মকরূহ। চাই একাধারে রাখুক অথবা পৃথক পৃথক রাখুক।

১২. রোজা রেখে কথা না বলার ব্রত পালন করা মকরূহ।

১৩. স্ত্রীলোকের জন্য স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোজা রাখা মকরূহ।

১৪. মোসাফির যদি রোজা রাখতে গিয়ে অত্যধিক দুর্বলতা অনুভব করে তবে তার জন্য রোজা করা মকরূহ হবে।

১৫. মোসাফির যদি রোজাদার হয় এ অবস্থায় যদি সে নিজ শহরে অথবা অন্য যে কোনো শহরে প্রবেশ করে সেখানে ১৫ দিনের অধিক বসবাসের সিদ্ধান্ত নেয় তখন রোজা ভাঙা তার জন্য মকরূহ হবে।

১৬. আরাফার দিনে দুর্বল হবার সম্ভাবনা থাকলে হাজীদের জন্য রোজা রাখা মকরূহ।

১৭. শুধু আশুরার দিন রোজা রাখা মকরূহ।

কাফ্ফারা

রমজান মাসের রোজা রেখে ভেঙে ফেললে তার উপর কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ) আদয় করা ওয়াজিব হয়। কাফ্ফারার বিধি এই যে একটি রোজা ভাঙলে তার পরিবর্তে একাধারে ৬০টি রোজা রাখতে হবে। মাঝে মাঝে বাদ দিয়ে রোজা রাখলে কাফ্ফারা আদায় হবে না। ধারাবাহিকভাবে ৬০ দিন রোজা রাখতে হবে।

এ সম্পর্কে আরো জানা প্রয়োজন যে–

১. কয়েকদিন রোজা রাখার পর যদি কোনো কারণে ছেদ পড়ে তবে পুনরায় ধারাবাহিকভাবে ৬০ দিন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত রোজা রাখতে হবে। আগেরগুলি হিসাবে ধরা যাবে না।

২. কাফ্ফারার রোজা রাখতে গিয়ে যদি ঈদ বা কোরবানী এসে পড়ার কারণে ছেদ পড়ে তবে ঐ একই নিয়মে ঈদ বা কোরবানীর পর ধারাবাহিকভাবে রোজা রাখতে হবে। আগেরগুলির হিসাব ধরা হবে না।

৩. একাধারে রোজা রাখতে গিয়ে যদি কোনো মহিলার হায়েজ আসে তবে মাফ। হায়েজ থেকে পাক হবার পর পরই পুনরায় রোজা রাখতে হবে এরকম অবস্থায় তার হায়েজ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী রোজাসমূহ ধারাবাহিক বলে গণ্য হবে।

৪. নেফাসের কারণে যদি ছেদ পড়ে তবে নেফাস পূর্ববর্তী রোজাসমূহ গণনায় আনা যাবে না। নেফাস পরবর্তী সময় থেকে একাধারে ৬০ রোজা করতে হবে।

৫. রোগের কারণে রোজায় ছেদ পড়লেও একই নিয়ম। রোগপূর্ববর্তী রোজা হিসাবে আসবে না। সুস্থতার পর লাগাতার ৬০ রোজা করতে হবে ।

৬. কাফ্ফারা আদায়ের মাঝখানে যদি রমজান মাস এসে পড়ে তবে কাফ্ফারা আদায় হবে না। রমজানের পর পুনরায় লাগাতার ৬০ রোজা করতে হবে।

অপারগতায় করণীয়

কাফ্ফারার রোজা আদায়ের শক্তি না থাকলে তাকে সহায়সম্বলহীন মিসকিনকে আহার করাতে হবে। অথবা খাদ্যবস্তু কিংবা তার মূল্য দান করতে হবে।

এ সম্পর্কে জেনে রাখা প্রয়োজন যে–

১. কাফ্ফারার রোজা রাখতে অসমর্থ হলে ১টি রোজার কাফ্ফারা হিসাবে ৬০ জন মিসকিনকে পেট পুরে দুই বেলা খাওয়াতে হবে।

২. অল্পবয়স্ক যারা পূর্ণবয়স্কদের সমান আহার করতে পারে না তাহাদেরকে হিসাবে ধরা হবে না। পূর্ণবয়স্ক ৬০ জন মিসকিন হতে হবে।

৩. পাকানো খাদ্য না খাইয়ে যদি ৬০ জন মিসকিনকে গম বা গমের আটা দেয় তবে তাও বৈধ হবে। কিন্তু গম বা গমের আটা দিতে হবে একজনের ফেতরার মূল্যমানের সমান।

৪. যদি নিজের কাফ্ফারা আদায়ের জন্য কেউ অন্য কোনো ব্যক্তিকে আদেশ করে বা অনুমতি দেয় তবে সেই ব্যক্তি কাফ্ফারা আদায় করলেও হয়ে যাবে। কিন্তু বিনা অনুমতিতে কেউ কারো কাফ্ফারা আদায় করলে তা আদায় হবে না।

৫. যদি ১ জন মিসকিনকে ৬০ দিন দুই বেলা পেট ভরে খাইয়ে দেয় অথবা যদি একজনকেই ৬০ দিন ৬০ বার ফেতরার সমমূল্যের গম দান করে অথবা ফেতরার মূল্য দান করে তবে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে।

৬. যদি ৬০ দিন খাওয়ানোর সময় অথবা গম বা উহার মূল্য (ফেতরা পরিমাণ) দানের সময় মাঝখানে দুই একদিন বাদ পড়ে তবে কোনো ক্ষতি নেই। সর্বমোট ৬০ দিন হলেই চলবে।

৭. ৬০ দিনের আহার্য বস্তু বা উহার মূল্য একই দিনে একজন মিসকিনকে দেয়া যাবে না। দিলে ১ দিনের কাফ্ফারা আদায় হবে। বাকী ৫৯ দিনের কাফ্ফারা পুনরায় আদায় করতে হবে।

৮. ১ জন মিসকিনকে একজনের ফেতরার কম মূল্যমানের কিছু দান করলে চলবেনা।

৯. যদি কোনো রমজান মাসে একাদিক রোজা ভেঙে থাকে তবুও একটি কাফ্ফারা (৬০ দিন) আদায় করতে হবে। বাকী রোজাগুলির জন্য ১টির বদলে ১টি এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

১০. যদি দুই রমজানে ২টি রোজা ভাঙা পড়ে তবে কাফ্ফারাও ২টি (৬০ দিন+৬০দিন) দিতে হবে।

রোজা রেখেও ভাঙা যায়

উপযুক্ত কারণ দেখা দিলে রোজা রেখেও ভাঙা যায়। সেরকম অবস্থায় রোজা ভাঙলে কোনো দোষও হবে না। বরং ভাঙাটাই সমীচীন হবে।

তাই জেনে নেয়া প্রয়োজন যে–

১. রোজা রেখে হঠাৎ যদি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে, এমন অবস্থা হয় যে, পানাহার না করলে অথবা ঔষধ না খেলে রোগযন্ত্রণা অসহনীয় হতে পারে অথবা জীবন নাশের আশংকা দেখা দেয় তবে পানাহার এবং ঔষধ বৈধ হবে। যেমন– হঠাৎ পেটে বেদনা শুরু হয়ে অস্থির করে তুললো অথবা হঠাৎ সাপে কামড় দিলো, ঔষধ না খেলে জীবনহানি হতে পারে অথবা হঠাৎ এমন পিপাসা অনুভব হলো যে পানি না পান করলে মৃত্যু হতে পারে– এ সকল পরিস্থিতিতে রোজা ভাঙা জায়েয। পরে সুস্থাবস্থায় এ রোজার কাজা আদায় করতে হবে।

২. রোজাদার গর্ভবতী কোনো মহিলার যদি এরকম অবস্থা হয় যে পানাহার না করলে তার বা তার সন্তানের জীবনহানি হতে পারে তবে রোজা ভাঙতে পারবে। পরে এ রোজার কাজা আদায় করতে হবে।

৩. আহার্য বস্তু রান্না করতে গিয়ে যদি কারো এমন অবস্থা হয় যে পিপাসায় প্রাণ ছটফট করে। পানি পান না করলে প্রাণবায়ু বের হতে পারে বলে আশংকা হয়, তবে তার জন্য রোজা ভাঙা বৈধ হবে। পরে এ রোজার কাজা করতে হবে।

সতর্কতাঃ একান্ত অসহনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেই কেবল রোজা রেখে ভাঙা যায়। ছলচাতুরী করে বা ইচ্ছাকৃতভাবে রোজা ভাঙলে কঠিন গোনাহগার হতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

মোসাফিরের রোজা

আল্লাহ্তায়ালা কোরআনুল করিমে এরশাদ করেন–

فَمَن كَانَ مِنكُمُ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ০

অর্থঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রোগগ্রস্ত থাকে অথবা ভ্রমণে থাকে (আর রোজা না রাখে) সে যেনো অন্য সময়ে এই সংখ্যা পূর্ণ করে।

হজরত রসূলেপাক স. ভ্রমণ অবস্থায় কখনো রোজা রেখেছেন, কখনো ছেড়েছেন। রমজান মাসে সফরকারীদের জন্য রোজা রাখা না রাখা– দুটিই তাদের ইচ্ছাধীন। ক্লান্তি বোধ না করলেও সফরে রোজা না রাখা মোসাফিরদের জন্য দোষণীয় নয়। বিষয়টি অধিকতর পরিষ্কার করার জন্য হাদিস শরীফ থেকে কতিপয় উদ্ধৃতি দেয়া হলো।

এক হজরত আয়শা সিদ্দিকা রা. এর বর্ণনা, হামজা বিন আমর আসলামী রা. অধিক রোজা রাখতেন। একদিন তিনি নবী পাক স. কে প্রশ্ন করলেন– ইয়া রসূলুল্লাহ। আমি কি সফরে রোজা রাখতে পারি? হুজুর স. জবাব দিলেন, যদি চাও রাখতে পারো যদি না চাও, নাও রাখতে পারো। – বোখারী, মুসলিম।

দুই হজরত আবু সাঈদ খুদরী রা. এর বর্ণনা, একবার রমজানের ষোলো তারিখে আমরা রসূলুল্লাহ স. এর সহিত জেহাদে ছিলাম। তখন আমাদের মধ্যে কেউ রোজা রেখেছিলেন, কেউ রাখেননি। কিন্তু আমরা কেউ কারো দোষ ধরিনি। – মুসলিম।

তিন হজরত জাবের রা. এর বর্ণনা, একবার রসূলুল্লাহ স. সফর করে দেখলেন একস্থানে লোকের ভীড়। ভীড়ের মধ্যে দেখলেন, এক লোকের উপর ছায়ার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে। তিনি প্রশ্ন করলেন– কী ব্যাপার? লোকেরা বললো– একজন রোজাদার। রসূলেপাক স. এরশাদ করলেন– সফরে রোজা রাখা নেকির কাজ নয়।

চার হজরত আনাস রা. এর বর্ণনা, একবার আমি রসূলেপাক স. এর সফরসাথী ছিলাম। আমাদের কেউ ছিলেন রোজাদার– কেউ বেরোজাদার। এক গরমের দিনে আমরা একস্থানে যাত্রাবিরতি করলাম। রোজাদারেরা ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে রইলেন আর বেরোজাদারেরা উঠে দাঁড়ালেন, তাঁবু খাটালেন, সকলের বাহনগুলোকে পানি পান করালেন। তখন হজরত স. বললেন– আজ দেখি বেরোজাদাররাই সওয়াব লুট করলো। –মুসলিম।

পাঁচ হজরত আনাস বিন মালেক কাবী র. এর বর্ণনাঃ রসূলুল্লাহ স. এরশাদ করেছেন– আল্লাহ্তায়ালা মোসাফিরদের জন্য (চিরদিনের জন্য) অর্ধেক নামাজ এবং মোসাফির, স্তন্যদানকারিণী মাতা ও গর্ভবতী রমণীদের জন্য (আপাততঃ) রোজা উঠিয়ে নিয়েছেন। –আবু দাউদ, তিরমিজী, নাসায়ী, ইবনে মাজা।

ছয় হজরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা এর বর্ণনা, হজরত রসূলেপাক স. রমজান মাসে মদীনা হতে মক্কার দিকে রওয়ানা হলেন। প্রথম কয়েক দিন তিনি ছিলেন রোজাদার। কিন্তু উছফান নামক মঞ্জিলে পৌঁছে তিনি রোজা অবস্থায় পানি চেয়ে নিলেন এবং পানির পাত্র উপরে উঠিয়ে সবাইকে দেখিয়ে পানি পান করে রোজা ভাঙলেন। মক্কা পৌঁছানো পর্যন্ত তিনি আর রোজা রাখেননি। অথচ তখন ছিলো রমজান মাস। –বোখারী, মুসলিম।

সাত হজরত হামজা বিন আমর আসলামী রা. এর বর্ণনা, আমি একবার সওয়াল করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ। আমি সফরে রোজা রাখতে সমর্থ। এতে কি আমার গোনাহ হবে? হুজুর স. এরশাদ করলেন– (সফরে) রোজা না রাখা আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ থেকে রোখসত। যে গ্রহণ করলো, সে উত্তম কাজ করলো আর যে রোজা করতে পছন্দ করলো তার কোনো গোনাহ হবে না। –মুসলিম।

এবার বিষয়টি পরিষ্কার যে, সফরে রোজা রাখা না রাখা মোসাফির ব্যক্তির ইচ্ছাধীন। রাখতে পারে। নাও রাখতে পারে। রাখলে নিয়ত করতে হবে যেহেতু নবী পাক স. সফরে রোজা রেখেছিলেন তাই রোজা রাখছি। ভাঙলেও নিয়ত করতে হবে যেহেতু হজরত রসূলেপাক স. রোজা ভেঙেছিলেন তাই ভাঙছি। জানা প্রয়োজন যে, হজরত রসূলেপাক স. এর অনুসরণের (ইত্তেবা) নামই ইবাদত।

রমজান মাসে সফরকারীদের জন্য আরো কিছু কথা জেনে রাখা প্রয়োজন। যেমনঃ–

১. যেদিন সফর শুরু করবে সেই রোজা ভাঙার কোনো কারণ নেই। দিনে সফর শুরু করলে রোজা ভঙ্গ করা জায়েয নেই।

২. যদি ভঙ্গ করে তবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

৩. যদি রোজা না রেখেই সফর শুরু করে তবুও কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

৪. সফরে বের হয়ে যদি কোনো স্থানে ১৫ দিনের বেশী অবস্থান করার নিয়ত করে তবে রোজা রাখতে হবে। কারণ কমপক্ষে ১৫ দিন কোথাও অবস্থান করলে আর মোসাফির থাকে না, মুকিম হয়ে যায়।

৫. যদি কেউ সফরের কারণে রোজার নিয়ত করেনি। কিন্তু কোনো পানাহারও করেনি। এমতাবস্থায় দুপুরের ১ ঘন্টা পরে যদি নিজের বাড়ী পৌঁছে যায় অথবা কোনো স্থানে পৌঁছে কমপক্ষে ১৫ দিন অবস্থানের নিয়ত করে, তবে তাকে রোজার নিয়ত করে ঐদিনের রোজা পূর্ণ করতে হবে।

৬. সফর কষ্টদায়ক না হলে রোজা রাখাই ভালো। কিন্তু ভাঙলেও গোনাহ হবে না। কষ্ট হলে না রাখাই ভালো। পরে এ রোজার কাজা করতে হবে।

৭. কেউ যদি রমজান মাসে সফরে রোজা না রাখে এবং বাড়ী ফিরে এসে কয়েকদিন পর মারা যায় তবে বাড়ীতে আসার পর যে কয়দিন সে সুস্থ ছিলো সেই কয়দিনের রোজার জন্য সে দায়ী হবে। ঐ কয়দিনের রোজার ফিদ্য়া দেয়ার জন্য তার অসিয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব (অবশ্য কর্তব্য)। যে কয়দিন বাড়ীতে ছিলো রোজা যদি তার চেয়ে বেশী দিন হয়ে থাকে তবে অতিরিক্ত দিনগুলোর ফিদ্য়া আদায় করা ওয়াজিব নয়। ঐদিন গুলোর জন্য তাকে জবাবদিহিও করতে হবে না।

৮. সফর অবস্থায় মারা গেলে আখেরাতে দায়ী হবে না। কারণ কাজা আদায়ের সময় সে পায়নি।

অসুস্থ ব্যক্তির রোজা

অসুস্থ ব্যক্তি রমজান মাসে রোজা ভাঙতে পারবে। কিন্তু পরে সুস্থ হলে ভাঙা রোজাসমূহের কাজা করতে হবে।

নিম্নবর্ণিত অবস্থায় রোজা না রাখা জায়েয।

১. রোগ বেড়ে যাবার আশংকা থাকলে।

২. রোগ দূরারোগ্য পর্যায়ে পৌঁছে যাবার আশংকা থাকলে।

৩. জীবনহানি হবার সম্ভাবনা থাকলে।

রোজা সম্পর্কে নিজের খেয়াল ধারণা বা কল্পনাই যথেষ্ট নয়। এ ব্যাপারে স্থিরনিশ্চিত হতে হবে। জানা প্রয়োজন যে–

১. দ্বীনদার চিকিৎসক যদি মত প্রকাশ করেন যে রোজা রাখলে ক্ষতি হবে, তখনই কেবল রোজা না রাখা যেতে পারে।

২. রোগী যদি তার বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা অথবা বার বার পরীক্ষা দ্বারা বুঝতে পারে যে, রোজা রাখলে অবশ্যই ক্ষতি হবে, তখনও রোজা ভাঙা যেতে পারে।

৩. শুধু ধারণা অভিজ্ঞতা নয়, তার সাথে মনেরও দৃঢ় সাক্ষ্য প্রয়োজন। তখনই কেবল রোজা ছেড়ে দেয়া যায়।

৪. দ্বীনদার চিকিৎসকের মতামত ব্যতিরেকে রোজা ছাড়লে কাফ্ফারা দিতে হবে। গোনাহও হবে।

৫. যদি পীড়িত ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করে, তবে আখেরাতে সে দায়ী হবে না। কারণ, কাজা আদায়ের সুযোগ সে পায়নি।

৬. রোজা অবস্থায় কারো ১০টি রোজা বাদ পড়েছে। সে পূর্ণ সুস্থ হবার ৫ দিন পর হঠাৎ মৃত্যুবরণ করলো। এখন তার জন্য ৫টি রোজা মাফ। কিন্তু বাকী ৫টি রোজার জন্য তাকে কেয়ামতে হিসাব দিতে হবে।

৭. রোগ আরোগ্যের পর ১০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর যদি প্রাণত্যাগ করে তবে ১০টি রোজার জন্যই জবাবদিহি করতে হবে।

৮. এরকম পরিস্থিতি অনুভব করতে পারলেই সেই ব্যক্তির উচিত যেনো বাদ পড়ে যাওয়া রোজার ফিদ্য়া আদায়ের জন্য অসিয়ত করে যায়। ফিদ্য়া আদায়ের সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যদি অসিয়ত না করে তবে সে গোনাহগার হবে।

৯. গর্ভবতী রমণী রোজা রাখলে যদি তার পেটের সন্তানের অথবা নিজের জীবনের ক্ষতি হয় তবে রোজা ছেড়ে দিতে পারবে।

১০. সদ্যপ্রসূত শিশুর জীবনের আশংকা থাকলে স্তন্যদানকারিণী রোজা ছেড়ে দিতে পারবে। পরে এর কাজা করতে হবে।

১১. স্বামী যদি সম্পদশালী হয় এবং ধাত্রী নিযুক্ত করে শিশুর দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে, কিন্তু শিশু নিজ মাতা ছাড়া অন্য কারো দুধ মুখেই নেয় না। এ অবস্থায় মাতার জন্য রোজা ছাড়া জায়েয। পরে কাজা করতে হবে।

হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় রোজা

হায়েজ ও নেফাসগ্রস্ত রমণীদের জন্য রোজা রাখা নিষেধ। এইসব কারণে বাদ পড়ে যাওয়া রোজা পরে সুস্থাবস্থায় কাজা করে নিতে হবে।

এ সম্পর্কে আরো জেনে রাখা প্রয়োজন যে–

১. যদি কোনো মহিলার হিসাবে হায়েজ আসার কথা। এই ধারণায় সে রোজা রাখেনি। পরে দেখা গেলো তার হায়েজ আসেনি। তবে কাফ্ফারা আদায় করা তার জন্য ওয়াজিব হবে।

২. যদি রাতে হায়েজ থেকে পবিত্র হয় এবং পূর্ণ ১০ দিন পরে পবিত্র হয়, তবে সকাল থেকেই রোজা থাকবে।

৩. যদি ১০ দিনের কমে পবিত্র হয়, তবে রাতে গোসল করবে। তারপর যদি ১ ঘন্টা রাত বাকী থাকে তবে রোজা রাখবে।

৪. যদি গোসল করার সঙ্গে সঙ্গেই ভোর হয়ে যায়, তবে রোজা রাখবে না। কেনোনা, হায়েজ যখন ১০ দিনের কমে হয় তখন গোসল করার সময়কেও হায়েজের মধ্যে ধরা হয়।

৫. রাতে যদি গোসল নাও করে তবু রাতে রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে সকাল থেকে রোজা রাখবে।

৬. ভোর হওয়ার পর রক্ত বন্ধ হলে রোজা জায়েয হবে না। কিন্তু রোজাদারের মতোই তাকে সারাদিন অতিবাহিত করা উচিত।

বার্ধক্যজনিত অবস্থায় রোজা

অতি বৃদ্ধ ব্যক্তি যারা রোজা রাখতে অসমর্থ এবং পরেও কাজা আদায় করতে সক্ষম নয় তাদের জন্য ফিদ্‌য়া দেয়ার বিধান আছে।

এ সম্পর্কে জেনে রাখা প্রয়োজন যে–

১. ফিদ্‌য়া দেয়ার পর যদি রোজা রাখার সামর্থ্য ফিরে পায় তবে রোজা রাখতে হবে। যদি কাজা করতে সক্ষম হয়, তবে কাজাও আদায় করতে হবে। এ অবস্থায় ফিদ্‌য়ার হুকুম বাতিল হয়ে যাবে।

২. বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম।

৩. প্রথম রোজার সময় যদি একবারে সমস্ত রোজায় ফিদ্‌য়া আদায় করা হয়, তবে তা জায়েয হবে। আবার রমজান শেষে একবারে সমস্ত রোজার ফিদ্‌য়া দিলেও জায়েয হবে।

ফিদ্‌য়ার বিধান

নামাজ বা রোজার পরিবর্তে যে সদকা দেয়া হয়, তাকে ফিদ্‌য়া বলে।

এ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপঃ–

১. প্রতি রোজার বদলে ১ জন মিসকিনকে দুইবেলা পেট ভরে খেতে দিতে হবে।

২. অথবা প্রতি রোজার পরিবর্তে ১জনের ফেতরা পরিমাণ গম বা সমপরিমাণ মূল্যের চাল বা টাকা দান করতে হবে।

৩. ১টি ফিদ্‌য়া ১ জনকে দেয়াই উত্তম। কিন্তু ১টি ফিদ্‌য়া যদি কয়েকজন মিসকিনকে ভাগ করে দেয়া হয়, তবুও জায়েয।

৪. চিররোগী ব্যক্তি যদি পুনরায় আরোগ্য লাভ করে এবং শক্তি ফিরে পায়, তবে যে সমস্ত রোজার ফিদ্‌য়া দেয়া হয়েছে, সেগুলোর কাজা আদায় করতে হবে। ফিদ্‌য়ার সওয়াব পৃথকভাবে পাওয়া যাবে।

৫. ফিদ্‌য়া বাকী থাকলে মৃত্যুর পূর্বে অসিয়ত করে যেতে হবে। এইরূপ অসিয়ত করলে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি থেকে (১) প্রথমে তার কাফনের ব্যবস্থা করতে হবে (২) তারপর তার ঋণ পরিশোধ করতে হবে (৩) তারপর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, তার তিন ভাগের এক ভাগ দিয়ে অসিয়ত অনুযায়ী ফিদ্‌য়া দিয়ে দিতে হবে। শরীয়ত মোতাবেক ওয়ারিশগণ এরকম করতে বাধ্য।

৬. যদি উক্ত নিয়মে তিন ভাগের এক ভাগ দ্বারা সম্পূর্ণ ফিদ্‌য়া আদায় না হয় তবে যতটুকু হয় ততটুকু আদায় করা ওয়াজিব। ওয়ারিশগণ যদি অবশিষ্ট পরিমাণ খুশী মনে আদায় করে দেয়, তবে তা অতি উত্তম এবং মৃত ব্যক্তির পরিত্রাণ লাভের উপায় হবে।

৭. মৃত ব্যক্তি যদি অসিয়ত না করে, তবে ওয়ারিশগণ তাদের পক্ষ থেকে ফিদ্‌য়া আদায় করে দেয় তবুও আশা করা যায় আল্লাহ্‌তায়ালা অনুগ্রহ করে তা কবুল করতে পারেন এবং মৃত ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিতে পারেন।

৮. অসিয়ত ছাড়া মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে ফিদ্‌য়া দেয়া বৈধ নয়।

৯. যদি ফিদ্‌য়া এক তৃতীয়াংশ থেকে বেশী হয় তবে অসিয়ত করা সত্ত্বেও সকল ওয়ারিশের বিনা অনুমতিতে বেশী দেয়া জায়েয নয়। সকলে খুশী মনে দিলে জায়েয আছে। কিন্তু নাবালেগ ওয়ারিশের অনুমতি মূল্যহীন। বালেগ ওয়ারিশগণ নিজ নিজ অংশ পৃথক করে নিয়ে যদি ফিদ্‌য়া দেয় তবে দোষ নেই।

১০. নামাজের ফিদ্‌য়া দেয়ারও নিয়ম একই।

১১. প্রতি ওয়াক্ত নামাজের ফিদ্‌য়া একটি রোজার সমান। ১ দিনের নামাজ কাজা থাকলে ৫ ওয়াক্তের জন্য ৫টি এবং বিতির নামাজের জন্য ১টি এই নিয়ে মোট ৬টি ফিদ্‌য়া দিতে হয়। এই নিয়মে যতদিন হয় হিসাব করতে হবে।

১২. মৃত ব্যক্তির পক্ষে যদি কেউ তার কাজা রোজা বা নামাজ আদায় করে দিতে চায়– তবে তা অবৈধ হবে।

রমজান সম্পর্কে সতর্কতা

রমজানের রোজা ফরজ। এ ব্যাপারে অবহেলা বা উদাসীনতা ক্ষমার্হ নয়। জেনে রাখা দরকার যে–

১. অকারণে রোজা না রাখা মহাপাপ। এরকম মনে করে না যে– পরে এর কাজা আদায় করে নিবো। হাদিস শরীফে আছে, সারা বৎসর ধরে রোজা রাখলেও রমজানের ১টি রোজার সমান ছওয়াব হবে না।

২. দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি কেউ রোজা না রাখে, তবে সে যেনো অন্যলোকের সামনে পানাহার না করে। গোনাহ করে গোনাহ প্রকাশ করাও বড় গোনাহ। যদি প্রকাশ্যে বলে বেড়ায়, তবে দ্বিগুণ গোনাহ। একটি গোনাহ করার। আর একটি গোনাহ্ প্রকাশ করার।

৩ যদি কেউ বলে আল্লাহ্তায়ালার কাছে তো কোনোকিছু গোপন নেই, সুতরাং মানুষের কাছে গোপন করে কি লাভ? এটা মারাত্মক ভুল।

৪. ৮/৯ বৎসরের ছেলে মেয়ে যখন মোটামুটি রোজা রাখতে সমর্থ হয়, তখন থেকেই তাদেরকে রোজা রাখার অভ্যাস করাতে হবে। সম্পূর্ণ রোজা না রাখতে পারলেও কিছু কিছু করার অভ্যাস করা উচিত। ১০ বৎসর বয়সের পর শাস্তি দিয়ে হলেও নামাজ ও রোজার অভ্যাস করানো প্রয়োজন।

৫. নাবালেগ ছেলেমেয়ে যদি ইচ্ছা করে রোজা করতে গিয়ে ভেঙে ফেলে, তবে এরকম করা ভালো নয়। কিন্তু যদি ভেঙেই ফেলে তবে সে রোজার কাজা করতে হবে না।

পঞ্চম অধ্যায়

কাজা রোজা

শরীয়তসম্মত কারণবশতঃ যদি রমজানের সকল রোজা অথবা কতিপয় রোজা না রাখতে পারে, তবে রমজানের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজা অথবা কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। জীবন অনিশ্চিত। সুতরাং কাজা রোজা আদায়ে শৈথিল্য অনুচিত। এজন্য গোনাহগার হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

এ বিষয়ে আরো কিছু কথা জেনে রাখা প্রয়োজন। যেমনঃ–

১. অমুক দিনের রোজার কাজা আদায় করছি– মনে মনে এরকম নির্দিষ্ট নিয়ত করতে হবে।

২. ঘটনাক্রমে যদি দুই রমজানের কাজা একত্রিত হয়ে যায় তবে নিয়ত করতে হবে যে 'আজ অমুক বছরের রোজার কাজা আদায় করছি।'

৩. কাজা রোজার জন্য ভোর হওয়ার আগেই নিয়ত করতে হবে। সোবহে সাদেকের পরে নিয়ত করলে শুদ্ধ হবে না। এরকম করলে সে রোজা নফল হয়ে যাবে। পুনরায় রোজার কাজা করতে হবে।

৪. কাফ্ফারার ক্ষেত্রে একই নিয়ম। সোবহে সাদেকের আগে কাফ্ফারা আদায়ের নির্দিষ্ট নিয়ত না করলে কাফ্ফারা আদায় হবে না। রোজা নফল হয়ে যাবে। কাফ্ফারা পুনরায় আদায় করতে হবে।

৫. বাদ পড়ে যাওয়া রোজা একনাগাড়েও রাখতে পারে। আবার বিরতি সহকারেও রাখতে পারে। একাধারে রাখা মোস্তাহাব (পছন্দনীয়)।

৬. বিগত রমজানের রোজা কাজা আছে। ইতোমধ্যে আবার রমজান মাস এসে গেলো। এখন বর্তমান রমজানের রোজাই রাখতে হবে। কাজা রমজানের পরে করতে হবে। এরকম দেরী করা ভালো নয়।

৭. রমজান শরীফে দিনের বেলায় যদি কেউ অজ্ঞান হয়ে পড়ে এবং কয়েকদিন ধরে অজ্ঞানই থাকে তবে প্রথম রোজার নিয়ত থাকার কারণে তার প্রথম রোজাটি হয়ে যাবে। পরেরগুলো হবে না। কারণ পরের গুলোর নিয়ত পাওয়া যায়নি। সুতরাং পরের দিনগুলোতে পানাহার না হওয়া সত্ত্বেও নিয়ত না থাকার কারণে পরের রোজাগুলো হবে না। সেগুলোর কাজা আদায় করতে হবে।

৮. যদি রাতে রোজার নিয়ত করার পর বেহুঁশ হয়ে যায় তবুও প্রথম রোজা হয়ে যাবে। বেহুঁশী অবস্থায় অতিক্রান্ত পরবর্তী দিনগুলোর কাজা করতে হবে। আর যদি নিয়ত না করে থাকে অথবা নিয়ত করা সত্ত্বেও যদি কোনো ঔষধ তার হুলকুমের নীচে যেয়ে থাকে তবে প্রথম রোজাটিও ভেঙে যাবে এবং তার কাজা করতে হবে।

৯. যদি কেউ সমস্ত রমজান মাস ধরে অজ্ঞান অবস্থায় থাকে তবে সুস্থ হবার পর সমস্ত রোজারই কাজা আদায় করতে হবে। এরকম মনে করবে না যে, অজ্ঞান থাকার কারণে রোজা একেবারে মাফ হয়ে গিয়েছে। অবশ্য যদি কেউ সমস্ত রমজান মাসব্যাপী পাগল থাকে– কিছুতেই সুস্থ না হয় তবে তাকে কাজা করতে হবেনা। কিন্তু রমজানের মধ্যে যখনই ভালো হয় তখন থেকেই রোজা রাখতে হবে।

১০. যার উপর রমজানের রোজা বাকী থাকে, তার নফল রোজা রাখা মকরূহ নয়।

তারাবীহ্ নামাজ

তারাবীহ্ নামাজ সুন্নতে মোয়াক্কাদা। জামাত করে মসজিদে পড়া সুন্নতে মোয়াক্কাদা কেফায়া। তারাবীহ্ নামাজের জামাত মসজিদেও হতে পারে। বাড়ীতে বা অন্য কোনো স্থানেও হতে পারে। তবে মসজিদের জামাতের ফজিলত বেশী। কেউ যদি একা একাও তারাবীহ্র নামাজ বাড়ীতে পড়ে তবুও নামাজ হয়ে যাবে। কোনো গোনাহ হবে না। কিন্তু যদি মসজিদে একেবারেই জামাত না হয়, তবে মহল্লার সবাই গোনাহগার হবে। যদি কিছু লোকে নিয়মিত জামাত করে, তবে অন্যরা বাড়ীতে একা একা নামাজ পড়তে পারবে।

এ সম্পর্কে মোটামুটি বর্ণনা এরকম–

১. রমজান মাসের চাঁদ দেখা গেলে তারাবীহ্ নামাজ শুরু হয়। শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা গেলে শেষ হয়। চাঁদ দেখার ভিত্তিতে কোনো রমজানে ২৯ দিন, কোনো রমজানে ৩০ দিন তারাবীহ্ পড়তে হয়।

২. এশার নামাজের পর, দুই রাকাত নিয়মিত সুন্নতে মোয়াক্কাদা নামাজ পড়ে নিয়ে তারাবীহ্ নামাজ পড়া শুরু করতে হয়। তারাবীহর পর বিতির পড়তে হয়।

৩. যদি কেউ ভুলবশতঃ এশার নামাজের আগে তারাবীহ্ পড়ে তারপর এশা পড়ে তবে তার নামাজ হবে না। তাকে পুনরায় এশার নামাজ পড়ে নিয়ে তারাবীহ্ পড়তে হবে।

৪. কিন্তু যদি ভুলে এশার আগে বিতির পড়ে ফেলে তবে বিতির এবং এশা দুই নামাজই হয়ে যাবে। কারণ বিতির এশার অধীন নয়। কিন্তু তারাবীহ্ এশার অধীন।

৫. তারাবীহ্ নামাজ মোট পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ভাগকে তারাবীহ্ বলে। এই হিসাবে মোট নামাজ পাঁচ তারাবীহ্। প্রতি তারাবী্তে চার রাকাত নামাজ। এই হিসাবে মোট নাাজ ২০ রাকাত।

৬. দুই রাকাত পর পর সালাম ফিরাতে হয়। চার রাকাত পর পর অর্থাৎ এক তারাবীহ্ পর পর এক তারাবীহ্ পরিমাণ সময় বসে বিশ্রাম করা মোস্তাহাব। কিন্তু এত বেশী সময় বসে থাকলে মোক্তাদীগণের কষ্ট হয় তবে সামান্য সময় বসলেও চলবে।

৭. এই বিশ্রামের সময় দোয়া করা, তসবী পড়া, জিকির করা, দরূদ শরীফ পড়া সবই জায়েয। এই অবস্থায় পড়ার জন্য নির্দিষ্ট কোনো দোয়া নেই। আমাদের দেশে প্রচলিত যে দোয়া পড়তে অনেকেই অভ্যস্ত সেই দোয়াটিও এ সময় পড়া যেতে পারে।

এই দোয়াটি তারাবীহ্ নামাজের দোয়া –

سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِيْ لاَ يَنَامُ وَلاَ يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلئِكَةِ وَالرُّوْحِ-

উচ্চারণ ঃ সোবাহানা যিল মুলকি ওয়াল মালাকুতে সোবাহানা যিল ইজ্জাতে ওয়াল আজমাতে ওয়াল হাইবাতে ওয়াল কুদরাতে ওয়াল কিবরিয়ায়ি ওয়াল জাবারুত সোবহানাল মালিকিল হাইয়িল্লাজি লা ইয়ানামু ওয়ালা ইয়ামুতু আবাদান আবাদান সুব্বুহুন কুদ্দুছুন রব্বুনা ওয়া রব্বুল মালাইকাতি ওয়াররূহ।

৮. 'আমি তারাবীহ্ নামাজ পড়ছি' এই রকম খেয়ালে নিয়ত করতে হবে। জামাতে দাঁড়িয়ে এই ইমামের এক্তেদা করলাম। এই রকম নিয়ত মনে মনে করতে হবে।

৯. যদি কেউ পৃথকভাবে এশার নামাজ পড়ে এসে তারাবীহ্র জামাতে শামিল হয়, তবে জায়েয হবে। কিন্তু যদি সকল লোক বাড়ীতে একা একা এশার নামাজ পড়ে নিয়ে তারাবীহ্র নামাজ জামাতে পড়ে তবে জায়েয হবে না।

১০. তারাবীহ্র নামাজের মধ্যে একবার কোরআন শরীফ খতম করা সুন্নত। মোক্তাদীর আলস্যের জন্যে কোরআন খতম ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।

১১. কিন্তু যদি ছোট সূরা দিয়েও তারাবীহ্‌র জামাত পড়া হয় তাতেও দোষ নেই।

১২. বেতন ঠিক করে তারাবীহ্‌র ইমাম নিযুক্ত করা জায়েয নেই।

১৩. প্রতি দুই রাকাতে কেরাআত সমান সমান হওয়া মোস্তাহাব যদি সামান্য বেশী হয় তাতে ক্ষতি নেই।

১৪. কেউ যদি মসজিদে গিয়ে দেখে যে, এশার নামাজের শেষে তারাবীহ্‌র জামাত শুরু হয়ে গিয়েছে তবে তাকে একা একা একপাশে দাঁড়িয়ে এশার নামাজ পড়ে নিয়ে জামাতে শামিল হতে হবে। তারাবীহ্ শেষে বিতিরও জামাতের সাথেই পড়বে। তারপর যে কয় রাকাত তারাবীহ্ বাদ পড়েছে তা একা একা আদায় করে নিবে।

১৫. যদি নিজের মহল্লার মসজিদের ইমাম কেরাআত ভুল পড়ে, তবে অন্য স্থানের তারাবীহ্‌র নামাজের জামাতে যাওয়ায় দোষ হবে না।

১৬. রমজান মাসে একা একা বিতির পড়া অপেক্ষা জামাতের সঙ্গে বিতির পড়া উত্তম। বিতির নামাজের জামাতের তিন রাকাতেই ইমাম সশব্দে কেরাআত পড়বেন। দোয়া কুনুত ইমাম মোক্তাদী সবাইকে চুপে চুপে পড়তে হবে।

১৭. যদি তারাবীহ্ নামাজ বাদ পড়ে যায় তবে কাজা আদায় করতে হবে না। কাজা পড়লে মকরূহ হবে।

১৮. ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে তারাবীহ্ পড়া মকরূহ।

১৯. তারাবীহ্ শেষ করে নীচের দোয়া পড়া যায়। এছাড়া অন্য যে কোনো দোয়াও পড়া যায়। তারাবীহ্ নামাজ শেষের মোনাজাত–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ يَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَاكَرِيْمُ يَاسَتَّارُ يَارَحِيْمُ يَاجَبَّارُ يَاخَالِقُ يَابَارُّ- اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَامُجِيْرُ يَامُجِيْرُ يَامُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুমা ইন্না নাসআলুকাল জান্নাতা ওয়া নাউজুবিকা মিনান্নার ইয়া খালেকাল জান্নাতি ওয়ান্নার বিরহমাতিকা ইয়া আযীযু ইয়া গাফফারু ইয়া করিমু ইয়া সাত্তারু ইয়া রাহিমু ইয়া জাব্বারু ইয়া খালিকু ইয়া বাররু, আল্লাহুম্মা আজিরনা মিনান্নার ইয়া মুজিরু ইয়া মুজিরু ইয়া মুজিরু বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রহিমীন।

অর্থঃ ইয়া আল্লাহ্ আমরা তোমার কাছে বেহেশত প্রার্থনা করি এবং দোজখ থেকে মুক্তি চাই। হে বেহেশত এবং দোজখের সৃষ্টিকর্তা, হে গোনাহ্ ক্ষমাকারী, হে পরম দাতা, হে অপরাধ আচ্ছাদনকারী, হে পরাক্রমের অধিকারী, হে দয়াময়, আপন মেহেরবানিতে আমাদের প্রতি সদয় হও। হে আমাদের আল্লাহ্, হে উদ্ধারকর্তা, হে মুক্তিদাতা, হে নিরাপত্তাদানকারী, হে শ্রেষ্ঠ করুণাময়, তোমার একান্ত করুণায় আমাদেরকে দোজখ থেকে রক্ষা করো।

মান্নতের রোজা

মান্নত পূর্ণ করা ওয়াজিব। যদি কেউ নামাজ, রোজা, সদকা ইত্যাদি কোনো ইবাদতের মান্নত করে তবে তা পুরা না করলে গোনাহ্গার হবে।

বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জেনে নেয়া প্রয়োজন। যেমন–

১. মান্নত দুই প্রকার। প্রথম প্রকারঃ দিন তারিখ নির্দিষ্ট করে মান্নত করা। দ্বিতীয় প্রকারঃ দিন তারিখ উল্লেখ না করে মান্নত করা। এই দুই প্রকারের প্রতিটির আবার দুই রকম অবস্থা আছে। এক রকম হচ্ছে শর্তযুক্ত মান্নত। যেমন, কেউ বললো আমার অমুক কাজ সিদ্ধ হলে আমি একদিন বা অনেক দিন রোজা রাখবো অথবা ৫০০ টাকা আল্লাহ্র রাস্তায় দান করবো। আরেক রকম হচ্ছে– বিনা শর্তে শুধু আল্লাহ্তায়ালার নামে মান্নত করা। যেমন কেউ বললো, আমি আল্লাহ্র নামে ৭টি রোজা রাখবো।

২. মান্নত উপরে বর্ণিত প্রকারের যে কোনো প্রকারই হোক না কেনো, আল্লাহ্র নামে মান্নত করলেই তা পুরা করা ওয়াজিব হবে।

৩. শর্তযুক্ত মান্নতের ক্ষেত্রে শর্তসিদ্ধ হওয়ার পর মান্নত পুরা করা ওয়াজিব হবে। যে কাজ সিদ্ধ হওয়ার শর্ত করে তা সম্পন্ন না হলে মান্নত পুরা করা ওয়াজিব (অবশ্যপালনীয়) হবে না।

৪. যদি কেউ বলে, 'আয় আল্লাহ্ আমার অমুক কাজ হয়ে গেলে কালই আমি তোমার উদ্দেশ্যে রোজা রাখবো' অথবা যদি বলে, 'আমার অমুক চাহিদা পূরণ হলে আগামী শুক্রবার আমি তোমার উদ্দেশ্যে রোজা পালন করবো' –এরকম মান্নতের ক্ষেত্রে রাতে রোজার নিয়ত করলেও চলবে। আবার দ্বিপ্রহরের ১ঘণ্টা আগে নিয়ত করলেও মান্নত আদায় হয়ে যাবে।

৫. যে শুক্রবার মান্নতের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে ঐদিন যদি সে মান্নতের রোজার নির্দিষ্ট নিয়ত না করে শুধু 'রোজা রাখছি' বা 'নফল রোজা রাখছি' বলে নিয়ত করে, তবুও মান্নতের রোজা আদায় হয়ে যাবে।

৬. কিন্তু যদি ঐ দিন কাজা রোজা রাখার নিয়ত করে, মান্নতের কথা স্মরণ ছিলো না অথবা স্মরণ ছিলো তথাপি কাজা রোজার নিয়ত করে– তবে কাজাই আদায় হবে। মান্নতের রোজা পরে করে নিতে হবে।

৭. দিন তারিখ নির্দিষ্ট না করে রোজা মান্নত করলে, সে সমস্ত রোজার নিয়ত রাতেই করতে হবে। সোবহে সাদেকের পর নিয়ত করলে রোজা নফল হয়ে যাবে। মান্নত আদায় হবেনা। কিন্তু নিয়তে যেহেতু নির্দিষ্ট দিন তারিখ নেই, সেহেতু এ ধরনের মান্নতের রোজা যে কোনো সময় আদায় করতে পারবে।

৮. শর্ত ছাড়া মান্নত রোজারও একই নিয়ম।

৯. যদি কেউ দুই তিন বা দশ দিন রোজার মান্নত করে, তবে এ সমস্ত রোজা লাগাতারও রাখতে পারে অথবা পৃথক পৃথকও রাখতে পারে।

১০. যদি এক নাগাড়ে র াখার নিয়ত করে তবে এক নাগাড়েই রাখতে হবে। বিরতি দেয়া চলবে না। যদি বিরতি দেয় তবে পুনরায় প্রথম থেকে রাখতে হবে।

১১. এরকম নিয়ত যদি কোনো মহিলা করে এবং বিরতিহীনভাবে রোজা করতে গিয়ে যদি হায়েজের কারণে রোজা ভেঙে ফেলতে হয়, তবে পুনরায় প্রথম থেকে রোজা শুরু করতে হবে।

১২. কারো ইচ্ছা ছিলো 'একদিন রোজা রাখবো' এই কথা বলবে। কিন্তু মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলো 'মাস ভরে রোজা রাখবো'– এখন তাকে মাস ভরেই রোজা রাখতে হবে। মান্নতের ক্ষেত্রে মুখের কথা অনুসারেই আমল করতে হয়। অন্তরের ইচ্ছা অনিচ্ছা সমান কথা।

১৩. মান্নতের পর পরই তা আদায় করা ওয়াজিব নয়। বিলম্বে মান্নত পুরা করলে গোনাহ্গার হবে না।

১৪. 'আমি রমজান মাসের মতো ১ মাস রোজা রাখবো'– এ রকম নিয়ত করলে বিরামহীনভাবে ১ মাস রোজা করতে হবে। যদি নিয়ত সংখ্যার দিক থেকে করে, তবে বিরতিহীন বা বিরতিসহ যে কোনোভাবে রোজা আদায় করতে পারবে।

১৫. যদি কেউ একমাসব্যাপী রোজার মান্নত করে তবে ঐ মাসের রোজা তার উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে। রোজা আদায়ের আগে মৃত্যুবরণ করলে তাকে ফিদ্য়ার জন্য অসিয়ত করে যেতে হবে।

১৬. কোনো রোগী যদি বলে 'আমি আল্লাহ্র ওয়াস্তে ১ মাস রোজা রাখবো' কিন্তু সুস্থ হবার পূর্বে মারা গেলে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না।

১৭. যদি ১ দিনের জন্যও সুস্থ হয়, তবে তার উচিত অসিয়ত করে যাওয়া।

নফল রোজা

নফল রোজার মধ্যে বৎসরে কয়েকটি দিন খুবই ফজিলতপূর্ণ। সেগুলো হচ্ছে–

১. মহররম মাসের দশ তারিখে আশুরার রোজা। যদি কেউ মহররম মাসের ১০ তারিখে রোজা রাখে, তবে তার বিগত ১ বৎসরের (সগিরা) গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু শুধু ১০ তারিখ রোজা রাখা মকরূহ্ (অপছন্দনীয়)। তাই ১০ তারিখের সঙ্গে ৯ তারিখে অথবা ১১ তারিখে রোজা রাখতে হবে।

২. জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখে রোজা রাখলেও বহু সওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়। হাদিস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি এই রোজা রাখবে তার বিগত এবং আগামী বৎসরের (সগিরা) গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে।

৩. শবেবরাতে (১৫ই শাবান) রোজা রাখাও খুবই ফজিলতপূর্ণ কাজ।

৪. শবেমেরাজে (২৭শে রজব) রোজা রাখা মোস্তাহাব। এতে অনেক সওয়াব পাওয়া যায়।

৫. ঈদের দিন (১লা শাওয়াল) বাদে শাওয়াল মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোতে রোজা রাখার মধ্যেও অনেক সওয়াব আছে।

নফল রোজা সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য জেনে নেয়া প্রয়োজন । যেমনঃ–

১. নফল রোজার জন্য নিয়ত এই যে– 'আমি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ১টি নফল রোজা রাখছি' অথবা 'আমি আল্লাহ্র নামে ১টি রোজা রাখবো।'

২. দ্বিপ্রহরের ১ ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত নফল রোজার নিয়ত করা যায়। কেউ যদি বেলা ১০টা পর্যন্তও রোজার নিয়ত না করে। ইতোমধ্যে সে পানাহারও করেনি। তারপর রোজা রাখার ইচ্ছা করলো। তখন নিয়ত করলেও নফল রোজা আদায় করা যাবে।

৩. সারা বৎসরে ৫ দিন রোজা রাখা যাবে না। দুই ঈদের দিন এবং ঈদুল আজহার পরে ১১ই ১২ই এবং ১৩ই জিলহজ্জ। এই ৫ দিন বাদে অন্য যে কোনো দিন নফল রোজা রাখা যায়।

৪. যদি কেউ ঈদের দিন মান্নত করে, তবুও ঈদের দিন রোজা রাখা অনুচিত। ঈদের পরে মান্নত আদায় করে নিবে।

৫. নফল রোজার নিয়ত করে নিলে সে রোজা পুরা করা ওয়াজিব হয়ে যায়। তাই নফল রোজা ভেঙে ফেললে তার কাজা করা ওয়াজিব হবে।

৬. রাতে নিয়ত করলো, 'আগামীকাল রোজা রাখবো' কিন্তু সোবহে সাদেক হওয়ার পূর্বে নিয়ত বদলে গেলো এবং রোজা রাখলোনা– এ অবস্থায় রোজা কাজা হবে না। সোবহে সাদেকের পরে নিয়ত করলে তার কাজা করতে হবে।

৭. স্বামী বাড়ী থাকলে স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রী নফল রোজা রাখতে পারবেনা। স্বামী যদি আদেশ করে তবে নফল রোজার নিয়ত করলেও তা ভেঙে ফেলতে হবে। কিন্তু পরে স্বামীর অনুমতি নিয়ে এ রোজার কাজা আদায় করতে হবে।

৮. মেহমানের সঙ্গে খাওয়াতে নফল রোজার চেয়ে সওয়াব বেশী। কেউ যদি নফল রোজা রাখা অবস্থায় সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে মেহমানের সঙ্গে আহার করে, তবে পরে এ রোজার কাজা করে নিবে।

৯. নফল রোজা ভেঙে কোনো মুসলমান বন্ধুর দাওয়াত কবুল করলেও পরে কাজা করতে হবে।

১০. যদি কেউ ঈদের দিন নফল রোজার নিয়ত করে, তবে রোজা ছেড়ে দিবে। এ রোজার কাজাও করতে হবে না।

শবে কদর

আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেন–

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ o وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِo لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍo تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ o سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِo

অর্থঃ এই কোরআন আমি নাজিল করেছি কদরের রাত্রিতে। (হে প্রিয় নবী) আপনি জানেন কি কদরের রাত্রি কি? কদরের রাত ১ হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। জিবরাইল ও ফেরেশতাগণ তাদের পরোয়ারদিগারের নির্দেশে সকল প্রকার কল্যাণ সহকারে এ রাতেই অবতীর্ণ হন। এ রকম চলে ফজর পর্যন্ত। –সূরা কদর।

কদরের রাতের মাহাত্ম্য সম্পর্কে কোরআনুল করিমের এই বর্ণনাই যথেষ্ট। এজন্যেই হজরত নবীয়েপাক স. এ রাতের ফজিলত সম্পর্কে তেমন কিছু উল্লেখ করেননি। তবে তিনি কোন্ মাসের কত তারিখে কদর হতে পারে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। আর এ রাতে আল্লাহ্তায়ালার নিকট কি চাইতে হবে ইত্যাদি উপদেশ প্রদান করেছেন।

হাদিস শরীফের বর্ণনাসমূহ বিশ্লেষণ করে বুঝা যায়, শবে কদর রমজান মাসেই এবং রমজান মাসের শেষ দশদিনের যে কোনো বেজোড় রাত্রিতে। কিন্তু রসূলেপাক স. এর প্রখ্যাত ও প্রিয় সাহাবী হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. মনে করতেন– বছরের অন্যান্য মাসের যে কোনো বেজোড় রাতেই কদর হতে পারে। ইমামে আজম আবু হানীফা রহ. এবং তাঁর অনুসারীরাও এই মত পোষণ করেন। তাঁদের বক্তব্যঃ হজরত নবীয়েপাক স. রমজান মাসেই কদরের রাত অনুসন্ধান করেছেন ঠিকই কিন্তু অন্য সময়ে কদরের সম্ভাবনাকে তিনি নাকচ করেননি। সুতরাং সারা বছরের বেজোড় রাত্রিতে কদর তালাশকারীরাই সফলকাম। হজরত মা আয়শা সিদ্দিকা রা. এর বর্ণনাঃ আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ স. আমি যদি কদরের রাত্রি পাই তবে কি বলবো? তিনি স. এরশাদ করলেন, তুমি বলবে–

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عفُوٌّ تُحبّ ٱلْعفْوَ فَأعفُ عَنِّي

হে আমার আল্লাহ্। তুমি ক্ষমা পরবশ। ক্ষমা করতে তুমি ভালোবাসো। অতএব আমাকে ক্ষমা করে দাও। –আহমদ, ইবনে মাজা, তিরমিজী।

এতেকাফ

আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন–

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ -

অর্থঃ এবং আমি ইব্রাহিম ও তার পুত্র ইসমাইলের প্রতি আদেশ অবতীর্ণ করলাম– তোমরা আমার ঘরকে পাক পবিত্র রাখো তাওয়াফকারী, এতেকাফকারী এবং রুকু ও সেজদাকারীদের জন্য। –সূরা বাকারা ১২৫ আয়াত।

এতেকাফ অর্থ কোনো স্থানে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখা। শরিয়তে এর অর্থ এক বিশেষ সময়ের জন্য এক বিশেষ নিয়মে মসজিদে অবস্থান করা।

এতেকাফ মানুষকে পৃথিবীর পেরেশানি থেকে মুক্ত হবার শিক্ষা দেয়। স্বল্প সময়ের জন্য হলেও আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে অটুট সম্পর্ক স্থাপন করতে সাহায্য

করে। এতেকাফের আমল থাকলে পৃথিবী পরিত্যাগ করা সহজ হয়। এতেকাফকারীর অন্তরে পৃথিবীপ্রেম অপেক্ষা আল্লাহ্প্রেম প্রবলতর হতে থাকে। এ সম্পর্কে হাদিস শরীফে উল্লেখ আছেঃ

এক আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদি আল্লাহু আনহুর বর্ণনা, হজরত রসূলেপাক স. রমজানের শেষ ১০ দিন এতেকাফ করতেন। – বোখারী, মুসলিম।

দুই হজরত আয়শা রাদি আল্লাহু আনহার বর্ণনা, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ নবী পাক স.কে মৃত্যুদান করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি রমজানের শেষ দশদিন নিয়মিত এতেকাফ করতেন। তারপর তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ এতেকাফ করতেন। –বোখারী, মুসলিম।

তিন হজরত আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহু আনহুর বর্ণনা, নবীপাক স. প্রতি রমজানের শেষ দশদিন এতেকাফ করতেন। তারপর যখন সেই বছরটি এসে গেলো যে বছরে তিনি ইন্তিকাল করলেন– সে বছর তিনি ২০ দিন এতেকাফ করেছিলেন। – বোখারী

চার যে ব্যক্তি রমজান শরীফের শেষ দশ দিন এতেকাফ করবে সে ব্যক্তি দুইটি হজ ও দুইটি ওমরার সওয়াব লাভ করবে । – বায়হাকী।

পাঁচ যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ নিয়তে খাঁটি বিশ্বাসের সঙ্গে এতেকাফ করবে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত গোনাহ্ (সগিরা) মাফ করে দেয়া হবে। – দায়লানী।

এতেকাফ তিন প্রকার। ওয়াজিব, সুন্নত ও মোস্তাহাব।

ওয়াজিব এতেকাফ

এতেকাফের মান্নত করলে পূর্ণ করা ওয়াজিব। ওয়াজিব এতেকাফ রোজা সহকারে আদায় করতে হবে। যদি কেউ রমজান মাসে এতেকাফের মান্নত করে তবে শুদ্ধ হবে।

সুন্নত এতেকাফ

রমজানের শেষ দশদিন এতেকাফ করা সুন্নতে মোয়াক্কাদা। একবার ছাড়া নবীপাক স. এই এতেকাফ বরাবর করেছেন। এই প্রকার এতেকাফ সুন্নতে মোয়াক্কাদা কেফায়া। মহল্লাবাসীদের মধ্য থেকে একজন এতেকাফ আদায় করলে সকলে গোনাহ থেকে বাঁচতে পারবে। যদি একজনও এতেকাফ না করে, তবে সবাই গোনাহগার হবে।

মোস্তাহাব এতেকাফ

ওয়াজিব ও সুন্নত এতেকাফ ছাড়া অন্য সমস্ত এতেকাফ মোস্তাহাব। এরকম এতেকাফ অল্প সময়ের জন্যও হতে পারে। মোস্তাহাব এতেকাফে রোজা শর্ত নয়। নামাজের জামাত হতে দেরী থাকলে মসজিদে ঢুকেই এতেকাফের নিয়ত করা ভালো।

এতেকাফ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. রমজান মাসের ২০ তারিখে সূর্যাস্তের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করতে হবে। ঈদের চাঁদ দেখার দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করতে হবে।

২. এতেকাফের জন্য ৩টি বিষয় জরুরীঃ

(১) নিয়মিত জামাত হয় এরকম মসজিদে এতেকাফ করতে হবে।

(২) এতেকাফের নিয়ত করতে হবে।

(৩) হায়েজ নেফাস ও গোসলের প্রয়োজন থেকে পবিত্র থাকতে হবে।

৩. এতেকাফের জন্য সর্বোত্তম স্থান হচ্ছে কাবা শরীফ। তারপর মসজিদে নববী। তারপর বায়তুল মুকাদ্দাস।

৪. এস্তেঞ্জার জন্য মসজিদের বাইরে যেতে পারবে। খাবার পৌঁছাবার লোক না থাকলে খাবার সংগ্রহের জন্য বাইরে যেতে পারবে। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক মুহূর্তও মসজিদের বাইরে থাকা চলবে না।

৫. মেয়েরা হায়েজগ্রস্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে এতেকাফ পরিত্যাগ করবে। এ অবস্থায় এতেকাফ নিষিদ্ধ।

৬. এতেকাফে স্বামী স্ত্রীর মিলন, আলিঙ্গন, সহবাস কোনটিই বৈধ নয়।

৭. ওয়াজিব এতেকাফ কমপক্ষে ১ দিন হতে হবে। ইচ্ছা করলে বেশীও হতে পারে। সুন্নত এতেকাফ ২০শে রমজান সূর্যাস্তের পূর্ব থেকে ঈদের চাঁদ ওঠার দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত। আর মোস্তাহাব এতেকাফের জন্য কোনো সময় নির্ধারিত নেই। এক মিনিট বা তার চেয়েও কম সময়ের জন্য হতে পারে।

৮. এতেকাফ অবস্থায় দুই প্রকার কাজ হারাম। এই দুই প্রকারের মধ্যে যে কোনো এক প্রকার কাজ করলে এতেকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। ওয়াজিব ও সুন্নত এতেকাফের কাজা আদায় করতে হবে। মোস্তাহাবের কাজা নাই।

প্রথম প্রকার

স্বাভাবিক এবং শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাওয়া হারাম। স্বাভাবিক প্রয়োজন হচ্ছে– প্রকৃতির চাহিদা পূরণ, লোক না থাকলে খানা খেতে যাওয়া, গোসল ফরজ হলে গোসল করতে যাওয়া। শরয়ী প্রয়োজন যেমন, জুমআর নামাজ।

জানা প্রয়োজন যে –

(১) প্রয়োজন পূরণ হলে এক মুহূর্ত বাইরে অবস্থান করা যাবে না।

(২) মসজিদের নিকটতম স্থানে এস্তেঞ্জার প্রয়োজন পূর্ণ করা উচিত। যেমন নিজের বাড়ী যদি দূরে হয় তবে নিকটবর্তী কোনো বন্ধুর বাড়ীতে এস্তেঞ্জার প্রয়োজন পুরা করবে। অবশ্য যদি এতে কোনো অসুবিধা হয় তবে দূরে হলেও নিজ বাড়ীতেই যাবে। মসজিদের পরিচ্ছন্ন বাথরুমও ব্যবহার করা যায়।

(৩) জুমআর নামাজের জন্য যদি অন্য কোনো মসজিদে যেতে হয় আর যদি নামাজ শেষে সেই মসজিদেই ইতেকাফ পুরা করে, তবে এতেকাফ পুরা হবে। কিন্তু এরূপ করা মকরূহ তানযিহি।

(৪) নিজ মসজিদের বাইরে ভুলক্রমেও ১ মিনিট বা তার চেয়েও কম সময়ের জন্য অযথা অবস্থান করা যাবে না।

(৫) কোনো মুমূর্ষু রোগী দেখতে যাওয়া, ডুবন্ত ব্যক্তিকে বাঁচাবার চেষ্টা করা, আগুন নিবাতে যাওয়া, কোনো মসজিদ ধ্বসে পড়ার আশংকায় মসজিদের বাইরে নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়া– এ সমস্ত ভালো কাজ বটে বরং ফরজও, কিন্তু এ সমস্ত করলে এতেকাফ আর থাকবে না।

(৬) জুমআর নামাজে যদি জামে মসজিদে যেতে হয় তবে এমন সময় সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবে যেনো দুখলুল মসজিদ ও সুন্নত নামাজ পড়া যায়। জুমআর ফরজের পর সুন্নত হয়ে গেলেই ফিরে আসবে।

(৭) এতেকাফকারীকে যদি জোরপূর্বক কেউ মসজিদের বাইরে নিয়ে যায়, তবে তার এতেকাফ নষ্ট হয়ে যাবে।

(৮) এরকম শরয়ী বা স্বাভাবিক প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার পর যদি কেউ তাকে আটকায় বা নিজেই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে যার ফলে এতেকাফের স্থানে পৌঁছতে বিলম্ব হয়, তবে তার এতেকাফ থাকবে না।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ

স্বামী স্ত্রীর মিলন, আলিঙ্গন, সহবাস এতেকাফ অবস্থায় হারাম। ইচ্ছাকৃত অথবা ভুলক্রমে– সকল অবস্থায় এতেকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। এতেকাফের কথা ভুলে মসজিদের ভিতরে বাইরে যে কোনো স্থানে করুক এতেকাফ বাতিল হয়ে যাবে। সহবাসের আনুষঙ্গিক কাজ– যেমন চুম্বন, আলিঙ্গন এসব এতেকাফ অবস্থায় নাজায়েয বটে কিন্তু এসবের দ্বারা এতেকাফ বাতিল হয় না। বীর্যপাত হলে এতেকাফ বাতিল হয়। অবশ্য যদি শুধু কল্পনা বা চিন্তার কারণে বীর্যপাত হয় তবে এতেকাফ নষ্ট হবে না।।

এ সম্পর্কে আরো জানা প্রয়োজন যে –

এক এতেকাফ অবস্থায় বিনা প্রয়োজনে দুনিয়াদারী কাজে লিপ্ত হওয়া মকরূহে তাহরীমি।

দুই ঘরে খোরাকী না থাকলে ব্যবসায়ী ব্যক্তি মসজিদে কেনা বেচার কাজ করতে পারে। কিন্তু মালপত্র মসজিদে রাখা যাবে না।

তিন ইবাদত মনে করে চুপ করে বসে থাকা মকরূহে তাহরীমি। ইবাদত না মনে করলে মকরূহ নয়।

গালি দিলে অথবা ঝগড়া করলে এতেকাফ ভঙ্গ হয় না। কিন্তু জিহ্বাকে গোনাহের কথা থেকে মুক্ত রাখা সওয়াবের কাজ।

চার এতেকাফ ফাসেদ হয়ে গেলে তার কাজা করা ওয়াজিব।

পাঁচ যত কষ্ট হোক শুধুমাত্র গোসল করার জন্য মসজিদের বাইরে যেতে পারবে না। যখন এস্তেঞ্জার জন্য বাইরে যেতে হয় তখন যদি আগে থেকে সেখানে বা ফেরার পথে গোসলের পানি আগে থেকে প্রস্তুত রাখা থাকে– তবে যত সংক্ষেপে সম্ভব গোসল করেই মসজিদে চলে আসতে হবে। শুধুমাত্র এভাবেই অজুর পরিবর্তে সুযোগমতো গোসল করে নেয়া যেতে পারে।

ছয় যদি কেউ ১ মাস এতেকাফ মান্নত করার পর মারা যায়, তবে তার উচিত অসিয়ত করে যাবে। প্রতিদিনের জন্য ১ জনের ফেতরা পরিমাণ মিসকিনকে দান করতে হবে।

সাত যদি অসুস্থ অবস্থায় ১ মাস এতেকাফ মান্নত করে এবং সে যদি আরোগ্য লাভের আগেই মারা যায় তবে তার উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না।

আট যদি সুস্থ হয়ে ১ দিনও অতিবাহিত করার পর মারা যায়, তবে সমস্ত মাসের ফিদ্‌য়া দিতে হবে।

ফেতরা

ফেতরা হচ্ছে রোজার যাকাত। যাকাত যেমন মালকে পবিত্র করে ফেতরা তেমনই রোজাকে পবিত্র করে। রোজার ত্রুটি বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ করে ফেতরা। ফেতরা রোজা কবুলের কারণ হয়।

এ বিষয়ে আরো কিছু নিয়ম কানুন জানা থাকা প্রয়োজন। যেমন–

১. ঈদের দিন যে সময় সোবহে সাদেক হয়– সেই সময় ফেতরা ওয়াজিব হয়। কাজেই সোবহে সাদেকের পূর্বে কেউ মারা গেলে তার ফেতরা দেয়া ওয়াজিব নয়। গৃহকর্তার কোনো সন্তান যদি সোবহে সাদেকের পূর্বে জন্মগ্রহণ করে তবে তার ফেতরা দিতে হবে। সোবহে সাদেকের পরে সন্তান জন্ম নিলে তার ফেতরা দিতে হবে না। সোবহে সাদেকের পর কেউ নতুন মুসলমান হলে তাকেও ফিতরা দিতে হবে না।

২. ফেতরা গম বা গমের আটা অথবা ছাতু দ্বারা আদায় করতে চাইলে অর্ধ ছা অর্থাৎ ৮০ তোলার সের হিসাবে ১ সের ১২.৫০ ছটাক দিতে হবে। কিন্তু পূর্ণ দুই সের দেয়াই ভালো। বেশী দিলে দোষ নেই বরং সওয়াব বেশী পাওয়া যাবে। পক্ষান্তরে কম দিলে ফেতরা আদায় হবে না।

৩. যব বা যবের ছাতু দ্বারা ফেতরা আদায় করতে চাইলে পূর্ণ এক ছা অর্থাৎ তিন সের নয় ছটাক দিতে হবে– তবে পূর্ণ চার সের দেয়া উত্তম।

৪. ধান, চাল, বুট, কলাই ইত্যাদি দ্বারা ফেতরা আদায় করতে চাইলে উপরোক্ত পরিমাণ গম বা যবের মূল্যমানের সমান দিতে হবে। মূল্য হিসাব করে না দিলে ফেতরা আদায় হবে না।

৫. গম বা যব অথবা তৎসমমূল্যের অন্য কোনো খাদ্যবস্তু না দিয়ে সেগুলোর মূল্য নগদ টাকায় দেয়া হয়, তবে ফেতরা আদায় হয়ে যাবে। বরং এটাই সর্বোত্তম।

৬. ১ জনের ফেতরা ১ জনকে দেয়া যায়। আবার এক জনের ফেতরা কয়েক জনকে ভাগ করে দেয়া যায়।

৭. যদি কয়েক জনের ফেতরা ১ জনকে দেয় তবুও জায়েয। কিন্তু এতবেশী পরিমাণ দেয়া যাবে না যাতে সে মালেকে নেসাব (যাকাত দেয়ার উপযুক্ত) হয়ে যায়।

কার উপর ফেতরা দেয়া ওয়াজিব

নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদের উপরে ফেতরা দেয়া ওয়াজিব। যেমন–

১. ঈদের দিন সোবহে সাদেকের সময় যে ব্যক্তি তার জীবিকা নির্বাহের অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ বাদে সাড়ে সাত তোলা সোনা, অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা, অথবা ঐ পরিমাণ সম্পদের অধিকারী থাকে, তবে তার উপর ফেতরা ওয়াজিব হয়।

২. যাকাতের জন্য ঐ পরিমাণ মাল পূর্ণ ১ বৎসর থাকা প্রয়োজন। কিন্তু ফেতরা ওয়াজিবের জন্য ঈদের দিন সোবহে সাদেকের সময় ঐ পরিমাণ সম্পদ থাকাই শর্ত।

৩. ঐ পরিমাণ সম্পদের অধিকারী না হয়েও যদি কেউ খুশী মনে ফেতরা দেয় তবে সে অনেক বেশী সওয়াব লাভ করবে। কারণ, হাদিস শরীফে আছে, সচ্ছল না হওয়া সত্ত্বেও যে আল্লাহ্তায়ালার পথে সদকা দেয়, তার দানকে আল্লাহ্পাক অত্যধিক পছন্দ করেন।

৪. মহিলাদের গহনা 'জীবিকা নির্বাহের অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ' হিসাবে গণ্য নয়। সুতরাং তাদেরকেও ফেতরা দিতে হবে যদি তার গহনা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমমূল্যের হয়।

৫. মহিলাদের শুধু নিজের ফেতরা দেয়া ওয়াজিব।

৬. পুরুষের ক্ষেত্রে নিজের ফেতরাও দিতে হবে। আবার নিজের ছেলে মেয়েদের জন্যও দিতে হবে। সন্তান নাবালেগ হলে তার ফেতরা দেয়া পিতার উপরে ওয়াজিব। আর বালেগ হলে এবং এক পরিবারভুক্ত থাকলে তাদের ফেতরা, স্ত্রীর ফেতরা এবং নির্ভরশীল বাপ মায়ের ফেতরা দেয়া মোস্তাহাব।

৭. নাবালেগ সন্তান যদি সম্পদের অধিকারী হয় তবে তার সম্পদ থেকে ফেতরা দিতে হবে। সম্পদ না থাকলে পিতাকে দিতে হবে।

৮. রোজাদার বেরোজাদার সকলের উপরেই ফেতরা ওয়াজিব।

৯. পিতার কোনো সাবালেগ সন্তান পাগল হলে তার ফেতরা দেয়া পিতার উপরে ওয়াজিব।

১০. এতিম সন্তান যদি সম্পদশালী হয়, তবে তাকেও ফেতরা দিতে হবে।

১১. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ বাদে যদি ফেতরা দানের উপযুক্ত হয় তবে ফেতরা দিবে। নতুবা নয়।

ফেতরা কখন দিতে হবে

কখন ফেতরা দিতে হবে সে সম্পর্কেও জানা থাকা একান্ত প্রয়োজন। যেমনঃ–

১. ঈদের নামাজের আগেই ফেতরা আদায় করে দায়িত্বমুক্ত হওয়া মোস্তাহাব। যদি কোনো কারণে আগে দেয়া সম্ভব না হয় তবে পরেই দিবে। পরে দিলেও ফেতরা আদায় হয়ে যাবে।

২. ঈদের দিনে ফেতরা না দিলে ফেতরা মাফ হবে না। অন্য সময় দিতে হবে।

৩. যদি ঈদের আগে রমজান মাসের মধ্যে ফেতরা দিয়ে দেয়, তবে তাও উত্তম। ঈদের দিন তাকে পুনরায় ফেতরা দিতে হবে না।

ফেতরা কাকে দিতে হবে

ফেতরা কাকে দিতে হবে সে কথাও ভালভাবে জেনে নেয়া প্রয়োজন। যেমনঃ–

১. ফেতরা দিতে হবে দরিদ্র দুঃস্থ আত্মীয় স্বজনকে, পাড়া প্রতিবেশীকে এবং আশেপাশের গরীব দুঃখীদেরকে।

২. সাইয়েদকে (নবী পাক স. এর বংশধর), সম্পদশালীকে, সম্পদশালী ব্যক্তির নাবালেগ সন্তানকে ফেতরা দেয়া যাবে না।

৩. নিজের মা, বাপ, দাদা, নানা, নানী কিংবা নিজের ছেলেমেয়ে, নাতি নাতনি এদেরকে ফেতরা এবং যাকাত দেয়া যাবে না।

৪. মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন কিংবা তারাবীহ নামাজের ইমাম দরিদ্র হলে তাদেরকে ফেতরা দেয়া যাবে। কিন্তু বেতন হিসাবে দেয়া যাবে না। বেতন হিসাবে দিলে ফেতরা আদায় হবে না।

৫. যাদেরকে যাকাত দেয়া যায়, তাদেরকে ফেতরাও দেয়া যায়।

শেষ বক্তব্য

আলহামদুলিল্লাহ। আজ রমজানের শেষ দিনে 'রমজান মাস' পুস্তক রচনার কাজ শেষ হলো। অনেক দিন ধরে অন্তরে ইচ্ছা ছিলো, রোজা সম্পর্কে একটি সহজ সরল এবং সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করি। আল্লাহ্পাক তাঁর অপার অনুগ্রহে হাকিমাবাদ জামে মসজিদে এতেকাফ অবস্থায় গ্রন্থ রচনার কাজ সম্পন্ন করার সুযোগ দিলেন।

সকল স্তুতির অধিকারী প্রভু পরোয়ারদিগার আল্লাহ্তায়ালা। সকল উৎকৃষ্ট দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক দয়াল নবী– মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ স. তাঁর ভ্রাতৃমণ্ডলী অন্যান্য নবী ও রসূলগণ, তাঁর স. পবিত্র পরিবার পরিজন, বংশধরগণ, সম্মানিত ও সুরক্ষিত সাহাবাবৃন্দ, সকল আউলিয়া কেরাম এবং পীর মোর্শেদ ইমামুল আউলিয়া হজরত হাকিম আবদুল হাকিম এর প্রতি। আল্লাহ্ পাক এই বইয়ের লেখক, পাঠক, পাঠিকা, প্রকাশক, প্রচারক– সবাইকে ক্ষমা করুন এবং সকলের নাম তাঁর প্রিয় বান্দা বান্দীগণের দপ্তরভুক্ত করুন। আমিন।

যে সমস্ত কিতাবাদির সহায়তায় 'রমজান মাস' রচিত হয়েছে সেগুলোর তালিকা নীচে উল্লেখ করা হলো ঃ-

১। ফতোয়ায়ে আলমগীর ২। বেহেশতী জেওর ৩। আরকানে আরবা'আ ৪। ফাজায়েলে রমজান ৫। মকতুবাত শরীফ ৬। মেশকাত শরীফ ৭। বোখারী শরীফ ৮। মুসলিম শরীফ ৯। রিয়াদুস সালেহীন ১০। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন।

ISBN 984-70240-0046-0